সাধনা

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস
চন্দননগর
১৩২৬

মূল্য দশ আনা

বোড়াইচণ্ডিতলা, চন্দননগর,
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস
হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কার্ত্তিক, ১৩২৬

সাধনা প্রেস,
চন্দননগর।

বিজ্ঞাপন

"প্রবর্ত্তকে"র পৃষ্ঠায় সাধনার কথাগুলি দিনে দিনে ফুলের এক একটি পাপড়ির মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুরাতন "প্রবর্ত্তকে"র পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব, এইজন্য পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে প্রথম বর্ষের কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র সমাহৃত করিয়া "সাধনা" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। পাপড়িগুলি একত্র যুক্ত করিলে "প্রবর্ত্তকে"র ভাব সাধনার একটা মোটামুটি অখণ্ড পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাধনার ক্ষেত্রে এই সকল প্রবন্ধ নূতন সাধকবর্গের যুগপৎ উপকার ও মনোরঞ্জন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

প্রকাশক

২৫এ কার্ত্তিক, ১৩২৬

সূচী

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২১	আবাঙ্মনসোগোচরং	অবাঙ্মনসোগোচরং
১৫	১৭	তুলে।	তুলে ?
২৯	৮	আবার	অসংখ্য
৩৮	৮	সাহিত্যক	সাহিত্যিক
৬৮	৬	বাংলার	ভারতের
৭০	২০	সমার্জ্জনীর	সম্মার্জ্জনীর

সাধনা

সাধনা

আমাদের সমস্ত জীবনটাই সাধনা। সিদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা জীবন-মরণের মধ্য দিয়া জন্ম-জন্মান্তর আসা যাওয়া করিতেছি। সিদ্ধি অর্থে নির্ব্বাণ নহে, শেষ নহে—আমি সৎ, আমার অস্তিত্ব জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। পুরুষের আনন্দ-হেতুই আমার আগমন—পুরুষের লীলা-চরিতার্থতাহেতুই আমার বিকাশ—পুরুষের ইচ্ছাপূরণের জন্যই আমার হাসি খেলা। এইটা বুঝিয়া, এইটা মানস প্রত্যক্ষ করিয়া যে দিন আমি সকল দ্বন্দ্বের পরপারে দাঁড়াইয়া, সুখ দুঃখ, স্বর্গ নরকের কাল্পনিক চিত্র পদদলিত করিয়া যুগধর্ম্মরক্ষার জন্য জ্ঞানতঃ কুণ্ঠাশূন্যহৃদয়ে আসা যাওয়া করিব, সেই দিন আমার সিদ্ধির সাফল্যের দিন, সেই দিন মুক্তির দিন, সেই দিন আমি সচ্চিদানন্দময় নিত্যলীলার অধিকারী। বিচিত্র এই, আমি এ তত্ত্ব বুঝি আর নাই বুঝি, এই

খেলাই আমার জীবনের মধ্য দিয়া অবিরাম চলিয়াছে। আমি জ্ঞানতঃ এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করি আর না করি, একটা বিপুল মহাশক্তির আমি যে যন্ত্রপুত্তলিকা ইহা অবধারিত। বুঝিলে দ্বন্দ্ব থাকে না, সব সমান হইয়া যায়, অহমিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যায়, হাসি কান্নার ভিতর অফুরন্ত আনন্দ ফুটিয়া উঠে।

পৌরাণিক লৌকিক যে কোন নির্দ্দিষ্ট সাধনপদ্ধতির দ্বারাই যে এই মহাসত্য জীবনের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে এরূপ নহে। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, কঠোর সংযম, নিরামিষ আহার, সায়াহ্নে হবিষ্যান্নগ্রহণ প্রভৃতি বাহ্য-সাধন-সাহায্যে যে আমরা জীবনের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, তাহা নহে। এইং সকলের দ্বারা জীবনের একটা অংশ বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, পরন্তু সমগ্র জীবনটা অনন্ত শক্তিসমুদ্রে শক্তির ইচ্ছামত অবাধ গতিতে ভাসিতে নাচিতে পারে না, অনন্ত প্রকৃতির অবাধ লীলা জীবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে না। আংশিক উন্নতি জীবনের লক্ষ্য নহে—আমরা চাই একটা পূর্ণ মনুষ্যত্ব, মানবজীবনের সম্যক্ পরিণতি।

হঠযোগ-সাধনে মানবের অন্নময়কোষের পরিণতি আসে, মানবশরীর কষ্টসহিষ্ণু হয়, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি বাহ্য-প্রকৃতির সকল অত্যাচার সে সহ্য করিতে পারে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রবল তাড়না সে যোগীকে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু এই হঠযোগে সিদ্ধ হইতে হইলে, একটা মানুষকে তার সমস্ত জীবনটা কঠোর যত্নের সহিত ইহা অভ্যাস করিতে হয়। অনেকের ভাগ্যেই সিদ্ধি ঘটে

না—যদিও সিদ্ধি আসে, মানব শরীরের অনিত্যতাহেতু, শরীরের ঐশ্বর্য্যে অনন্ত মানব-জীবনের সাফল্য কোথায়? এই স্নায়ুময় দেহযন্ত্রের পরিণতিলাভেই যদি জীবনের মূল সূত্র বাহির হইত, তাহা হইলে কোনই কথা ছিল না, কিন্তু তাহা ত হইবে না। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষগুলি শুদ্ধ করিবার জন্য রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সাধন করিতে হইবে। হায় অন্নগত কলির জীব! প্রাচীন পৌরাণিক্ সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দুর্নিবার জীবনসমুদ্র অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইতেছ, কিন্তু কালের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা কি বুঝিতেছ না? প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের বীর্য্য স্থৈর্য্য বর্ত্তমানে নাই, প্রাচীন যুগের দীর্ঘ পরমায়ু বর্ত্তমান্ ভারতে অতীব বিরল—সে অনুকূল অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন কর।

শাণিত যন্ত্র ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে পুনরায় শাণযন্ত্রে ধরিতে হয়; যন্ত্রের কার্য্যকারিতা ফিরিয়া আসে। যন্ত্র সীমাবদ্ধ, কিছুক্ষণ শাণযন্ত্রে ধরিলেই ইহা কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। আমাদের এই জীবনযন্ত্র কিন্তু অনন্ত; ইহাকেও ইহার সাফল্যসাধনের জন্য একটী শাণযন্ত্রে ধরিতে হইবে, কিন্তু অনন্ত কালের জন্য ধরিয়া রাখিতে হইবে। এই শাণযন্ত্র ভাব। মানুষকে ভাবে থাকিতে হইবে। এই ভাবসাধনার কথাই বলিতেছি। অবিচ্ছেদ ভাবপ্রবাহ আপনার ভিতর প্রবহমান রাখাই সাধনা। কিছু করিতে হইবে, কিছু হইতে হইবে, একটা সাধু, একটা

যোগী, একটা বীর, বা যে কোনরূপে একটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইবে—এইরূপ বাহ্যিক ভাবসমূহ ভিতরে রাখিলে জীবনের আসল তত্ত্বটা ধরা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, আমার কিছু হওয়া, সে একেবারেই আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তাই বলিতেছিলাম আমাদের সমস্ত জীবনটাই যোগ—আমাদের জীবনের সকল ঘটনাই সাধনা। আত্মদৃষ্টি থাকিলে অনায়াসেই আমরা বুঝিব যে আমাদের বুদ্ধি অবিরত কত কল্পনার সৃষ্টি করিতেছে, মন ভাবের রসে তাহাকে রঞ্জিত করিতেছে, প্রাণ কামনার সৃষ্টি করিয়া তাহা ঘটাইবার জন্য সমস্ত শরীরযন্ত্রের দ্বারা কত আয়াস করিতেছে, কিন্তু ঘটিতেছে যাহা কখনও কল্পনা করি নাই, যাহা কখনও ভাবি নাই, যাহা কখনও কামনা করি নাই; তখন কি জীবের চৈতন্য হয় না যে মন প্রাণ বুদ্ধি শরীর ব্যতীত আর একটা কিছু আছে, যে আমায় নাচায়, কাঁদায়, হাসায়, যে আমায় চুরি করায়, দান করায়, ধ্বংস করায়, সৃষ্টি করায়; যে আমায় মূর্খ করে, বিদ্বান্ করে, ধার্ম্মিক করে, অধার্ম্মিক করে। সে কে? সেই প্রকৃতি, যাঁহার অঙ্গুলীহেলনে আমার জীবন, আমার উৎপত্তি, আমার স্থিতি, আমার মৃত্যু। কথা বড় সহজ, কিন্তু দৃঢ়ভাবে এই ভাব আয়ত্ত করা বড় কঠিন। বাহিরের কার্য্য দেখিয়া উহার প্রতিকারপরায়ণ হইলে ভিতরের এই গুপ্তরহস্য কোন কালেই আমরা বুঝিব না। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি জীবনের বহির্বিকাশের বিবরণ মাত্র—উহা দিয়া জীবনের সমস্যা কোনও কালেই পূরণ হয় নাই, হইবেও না।

মানুষকে বুঝিতে হইবে, যে সে যাহা করে তাহা ভগবদিচ্ছায়, যাহা ঘটে তাহা ভগবদিচ্ছায়, প্রতিনিয়ত শ্বাসে প্রশ্বাসে, শয়নে ভোজনে, সর্ব্বসময়ে সর্ব্বকর্ম্মে প্রকৃতির লীলারই সে কেন্দ্র মাত্র, ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃতির অবাধ ইচ্ছাপূরণের জন্যই তার জীবন, তার অনন্তকাল স্থিতি। মানুষ তখনই নিত্যানন্দের অধিকারী হইবে, যখন ভিতরের এই আসল সত্যটাকে সে ধরিতে শিখিবে।

বাংলার শ্যামল পল্লীক্ষেত্র কাঁপাইয়া যে মহাসাধক এই অধ্যাত্ম-যোগের কথা গ্রাম্য ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁর উচ্চারিত প্রতিবর্ণ আয়ত্ত করিবার দিন আসিয়াছে—

ওরে মন বলি ভজ কালী, তোর ইচ্ছা হয় যে আচারে।
গুরুদত্ত সাধনমন্ত্র দিবা নিশি জপ করে'।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
তুমি নগর ফের, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শুন কর্ণপুটে, সকলই মার মন্ত্র বটে,
মা যে পঞ্চাশবর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
তুমি আহার কর, মনে কর আহুতি দাও শ্যামা মারে।

আজ সাধক রামপ্রসাদের অমর সঙ্গীত, ভারতের জাতীয় জীবনের উপাদান হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

ভগবানে বিশ্বাস

মানুষ তখনই সর্ব্বানন্দ ভোগ করে, যখন সে তার ভিতরেব মূল তত্ত্বটাকে ধর্তে পারে। এই মূল তত্ত্বটাকে ধরাই জীবনের উদ্দেশ্য। আর যা সব ঘট্‌ছে, সেগুলি কেবল বুঝিয়ে দেয়—যে আমরা এখনও জীবনের আসল সূত্র খুঁজে বার্ কর্‌তে পারি নাই। ••

জীবনের উপরের কার্য্যগুলি—যা আমরা সহজেই ধর্‌তে পারি, বুঝ্‌তে পারি—তাদের ধারা, তাদের উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করি, কিন্তু তা দিয়ে বেশী দূর যেতে পারি না। সেই সকল বাহিরের জ্ঞান কতকদূর নিয়ে গিয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়—আমরা ঘুরেফিরে আবার পুরাতন জায়গায় ফিরে আসি। এই রকম করে' জীবনের আসল উদ্দেশ্যটার সন্ধান জন্ম জন্ম আমরা করে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

প্রকৃতির আসল অভিসন্ধির অভিব্যক্তি বাহিরে এমন বিচিত্র-ভাবে ছড়িয়ে আছে, যে সে সকলকে গুছিয়ে একত্র করাই যায় না, তার পর তা থেকে প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপণ করা ত দূরের কথা। জীবনের সমস্ত ঘটনার অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে যে একটা বিপুল মহা-শক্তি বিরাজ কর্‌ছেন, তাঁকে ধরে ফেল্‌তে হ'লে, বাহিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিতরের দিকে চাইতে হবে। প্রথম দৃষ্টিতে সে দিক্‌টা ভীষণ অন্ধকার—অন্ধকারের উপর নিবিড় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে—কিন্তু খুব কঠোর সঙ্কল্পের সহিত সেদিকে

একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে সেই গভীর আঁধার ভেদ করে' একটা শুভ্র জ্ঞানের আলো ছুটে বেরিয়ে আসছে দেখতে পাবে--সে আলোক একবার দৃষ্টিপথে পড়লে আর ভাবতে হবে না।

প্রথমে কিছু দেখতে না পেলেও, দৃঢ় সংকল্পের সহিত একটা বিকট আঁধারের দিকে চেয়ে থাকাও সাধনা। অন্ধকারের পেছনে আমার আকাঙ্খিত বস্তু আছে, এ ধ্রুব বিশ্বাস না থাকলে আমরা কখনই অনির্দ্দিষ্ট কালেব জন্য একদিকে চেয়ে বসে' থাকতে পারি না।

ভগবানের উপর যাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁরা যে সকলেই তাঁকে দর্শন করেছেন, এরূপ নহে—সকলেই যে তাঁকে মানস-প্রত্যক্ষ করে' তাঁর প্রতি বিশ্বাসবান্ হয়েছেন এমনও নহে—যাঁকে দেখি নাই, যাঁর মুখের কথা শ্রবণগোচর করি নাই—যিনি স্পর্শের অতীত, জ্ঞানের অতীত, ভাবের অতীত, তাঁকে যা দিয়ে আমাদের মনে এমন অটল আসন পেতে দিতে সমর্থ হয়েছি, সেই জিনিষটাকে ধরে' ফেলতে পারলেই সাধনার অনেক জটিল রহস্য সরল হ'য়ে আসবে।

সেটা কি? বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আকাশ থেকে পড়ে নাই—একদিনের শ্রবণেই ইহার ভিত্তি এমন দৃঢ় হ'য়ে উঠে নাই। শরীর-পুষ্টির জন্য নিত্য যেমন আহার্য্য গ্রহণ করেছি, এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে' তোলবার জন্য সেই মত আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত শুনে এসেছি—যে তিনি অবাঙমনসোগোচরং হলেও আছেন। বাস্তবিক ভাবলে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়, কেমন করে' এই বিশ্বাস অতি সহজ

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের হৃদয়মন্দিরে এসে স্থান পেয়েছে। অতি শৈশবে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ে পাঠ করেছি "তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান্"। এ বিশ্বাস সে দিন এমন জীবন্ত হয়ে উঠে নাই। কিন্তু আজ অবধি ঐ একই কথার দ্যোতনা দিবানিশি শুনে শুনে শোণিতের প্রবাহমধ্যে ঐ বিশ্বাস সেঁদিয়ে গিয়েছে—যুক্তি নাই, তর্ক নাই—তিনি আছেন; প্রমাণ নাই, বিচার নাই—তিনি আছেন। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এ জ্ঞান আমার অটল অক্ষয় হয়ে থাক্‌বে।

আমরা বলেছি—জীবনটাই আমাদের যোগ, জীবনের সকল কার্য্যই সাধনা। কোনও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন কর্‌লেই আমরা একটা নূতন সংস্কারের দাস হ'য়ে পড়্‌ব, একটা সঙ্কীর্ণ রেখার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে যাব।

ভগবানের নাম যেমন করে' আমাদের কাণে স্বভাবক্রমেই পৌঁছে গেছে, তিনি আছেন, তাঁকে জানি আর নাই জানি, তবুও তিনি নিশ্চয়ই আছেন—এ বিশ্বাস যেমন সহজ জীবনপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিতেই আমাদের মনের উপর অটল আসন পেতেছে, জীবনের চরম সাফল্যও তেমনি প্রকৃতির বশে একদিন এসে উপস্থিত হবে। মনে রেখো আস্তিক্যবুদ্ধিও মানবজীবনের একটা মস্ত সিদ্ধি—বহু সাধনার ফল।

পরিবর্ত্তন

পরিবর্ত্তন জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আজ মানুষের ভিতর যে ইচ্ছা, যে প্রবৃত্তির জাগরণ পরিলক্ষ্য করিতেছ, কাল দেখিবে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কাল যাহাকে নিরীহ শিশু, ক্রীড়াকৌতুক ও পাঠশিক্ষায় রত দেখিয়াছ, আজ সে যৌবনোচিত উদ্যম, উৎসাহ, আকাঙ্খা, প্রতিভার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে —প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব রহস্য যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারাই যথার্থ নেতা, শিক্ষক, গুরু এবং নৃপতিরূপে জগৎ শাসন করিতে পারেন। এই পরিবর্ত্তনের একটা স্বাভাবিক ক্রম আছে, ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই একদিনে বড় হইতে পারে না—এই ক্রম মানিয়া সকলেই মঙ্গলময়ের শুভ উদ্দেশ্যের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

মানুষের জীবনের মত জাতীয় জীবনেও এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আজ যে জাতি দুর্ব্বল, ভীরু, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, সে যে চিরকাল এই ভাবেই কালাতিপাত করিবে, এইরূপ কখনই হইতে পারে না। এ বিশ্ব বাস্তবিকই বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীল।

এরূপ কেন হয়? প্রকৃতিদেবীই জগদ্বিকাশের আদি রাণী। প্রকৃতি নিত্য ক্রিয়াশীলা—তাঁর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরাম অক্লান্ত ছুটিয়াছেন। তাঁহার পূর্ণত্ব পুরুষের সম্মিলনে। এ মিলন না ঘটা অবধি তাঁর নিত্য নূতন বিকাশ। এই

বিকাশই তাঁর অবিরাম গতির অভিব্যক্তি। তাই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

এই পরিবর্ত্তনের পথ দিয়া প্রকৃতি পুরুষের অভিসারে গমন করেন। লতায় পাতায়, ফলে ফুলে, জলে স্থলে, কাননে পর্ব্বতে, কীট পতঙ্গে, পশু পক্ষীতে, জগতের যাবতীয় পদার্থেই পরিবর্ত্তনের খেলা দেখিতে পাইবে, এটা গতির লক্ষণ, প্রকৃতিরাণীর পদচিহ্ন। মানব তাঁর প্রধান যন্ত্র, যাহা দিয়া তিনি চিন্তা করেন—সে চিন্তা পুরুষের, আনন্দময় মহাদেবতার, যাঁর সম্মিলনে জগতে স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। মানুষের মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতি পুরুষের চিন্তা করেন, মানুষের মধ্যে থাকিয়া তিনি তাঁকে ভালবাসেন, মানুষের মধ্যে থাকিয়া তাঁকে নিত্যকালের জন্য হৃদয়ে ধরিবার বাসনা পোষণ করেন। তাই মানব শ্রেষ্ঠ, মানব মহামহিমান্বিত। তাই সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইল পড়ে', আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা॥"

এই পুরুষকে পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য মানুষের মধ্যে স্মরণাতীত যুগ হইতে কত চেষ্টা হইয়াছে; কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাহাকে চলিতে হইয়াছে। মানুষকে লইয়াই এক একটা জাতির সৃষ্টি, সুতরাং জাতিগত কত পরিবর্ত্তন ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং বলিতেছে—এখনও যাহা গড়িতেছে, তাহা ভাঙ্গিবে, আবার গড়িবে, আবার ভাঙ্গিবে; কোনও খুঁত থাকিতে সনাতনের

প্রতিষ্ঠা হইবে না এবং এই সত্যযুগের নূতন সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের ভাব, মানুষের চেষ্টা, মানুষের কার্য্য ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়াই চলিবে।

আমরা আজ যে যুগে অবস্থান করিতেছি, তাহা এইরূপ মহা-পরিবর্ত্তনের যুগ। অতীতের মানবসমাজ, মানবসভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভ্রান্ত সে, যে তাহার পদতলের মৃত্তিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। সাধক তাহাতেও আনন্দযুক্ত, কেননা সে নিরহঙ্কার, সে জানে প্রকৃতির হাতে পূর্ণ হইবার জন্য সে আবার নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।

হিন্দুর বিশ্বাস—ভারতবর্ষ ভগবানের প্রিয় আবাস; যুগ যুগান্তরের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়। তাঁর বিশিষ্টলীলা এই-খানেই পূর্ণ প্রকট। অতএব হে ভারতের সাধকমণ্ডলী, আজ সমগ্র জগতের এই বিপুল পরিবর্ত্তনের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া হতা-শ্বাস হইও না, পরন্তু উল্লসিত হও, কারণ সমগ্র বিশ্ব সনাতনের পথে আজ দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ভেদ ভাঙ্গিয়া স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে তৎপরা। শীঘ্রই এই যুগলরূপ দেখিয়া আমরা ধন্য হইব।

সহজ কথা

যে বস্তু জীবনের চরম সাফল্য তাহা সহজ এবং সরল নহে, এইরূপ ধারণাই মানুষকে বাঁকা পথ অবলম্বন করায়। ভগবান্—যাঁহাকে কোটী কোটী জন্ম তপস্যা করিয়াও মুনিঋষিগণ জ্ঞানগম্য করিতে পারেন নাই, তত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণ যাঁহার আদিহীন তত্ত্বের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, তিনি কেমন করিয়া সহজ ও সরলভাবে মানুষের বোধগম্য হইবেন? তাই তাঁর জন্য অতি কঠোর সাধন অবলম্বন করিতে হয়, জন্ম জন্ম তপস্যা করিতে হয়, সকল ভোগ দূরে রাখিয়া অরণ্যবাসী হইতে হয়, ইন্দ্রিয়জয়ী হইবার জন্য হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ জিহ্বা প্রভৃতিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, উপবাস করিতে হয়, জপ হোম, যাগযজ্ঞ, কতবিধ উপায় এবং অনুষ্ঠান যে অবলম্বন করিতে হয়, তাহার নিরাকরণ করা যায় না।

একদিন স্বপ্নযোগে একজন তপস্বীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তাঁহার মাংসপেশীশূন্য অস্থিচর্ম্মসার শরীর এখনও আমার নয়ন-সমক্ষে নৃত্য করিতেছে। তিনি পদ্মাসন করিয়া বসিয়া আছেন, মাথার চুল জটিল এবং রুক্ষ, ওষ্ঠ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ খড়িময়। কত বৎসর, কত যুগ তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তিনি এখনও ভগবানের ধ্যান-নিরত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহার এখনও ভগবদ্দর্শন হয় নাই, সংখ্যাতীত বৎসর তাঁহার উদ্দেশ্যেই তিনি যোগনিরত। আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম—যেন সমগ্র ভারতবর্ষটাই আমার এইরূপ মনে হইল—ভগবান-

লাভের জন্য যেন সে জগতের সমস্ত উপদ্রবের বাহিরে এক নির্জ্জন কুটীরে ভগবান্ ভগবান্ করিয়া ধ্যানমগ্ন। এই মূর্ত্তিসন্দর্শনে ভগবানের জন্য যেটুকু চেষ্টা আমার ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। আমি ভাবিলাম, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি এই কঠোর তপস্যা সাধন করিয়া আসিতেছেন, অথচ এখনও ভগবানের রসাস্বাদ ইঁহার জন্মে নাই, তখন ভগবান্ নিশ্চয় ধ্যানাতীত। শুধু ধ্যানের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না।

ভগবান্‌কে আমরা যখনই কোথাও গণ্ডীবদ্ধ মনে করি, তখনই সাধনার পথ জটিল এবং উৎকট হইয়া উঠে। তিনি যে অতি সরল এবং সহজ এইটা আমাদের ধারণায় আসে না, অথচ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছে—তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তিনি ধ্যানাতীত, জ্ঞানাতীত, সকল যত্ন চেষ্টার বহির্ভূত—কিন্তু তিনি আছেন। সর্ব্বত্র আছেন। সর্ব্ব কর্ম্মে আছেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য কিছুই করিতে হয় না, এইটা যখন আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে জাঁকিয়া বসে, তখনই এই সত্য ভাসিয়া উঠে, জীবের অন্তরে তিনি অনন্ত ভাবে, রূপে, রসে, বিকশিত হইয়া উঠেন। অনেক চেষ্টা করিয়া যখন আমরা বিফলমনোরথ হই, বহু জন্ম কঠোর তপস্যায় যখন আমরা হতাশ হইয়া কোন্ অজানিত মহাদেবতার উদ্দেশে আকাশের দিকে চাই, তখনই তাঁহাকে আমরা পাই, অন্তর্দেবতার সমস্তটাকে এই দুটি বাহু দিয়া তখন জড়াইয়া ধরি।

এক্ষণে কথা হইতেছে, আমাদের তাঁহাকে পাইবার জন্য

চেষ্টার কি ত্রুটি হইয়াছে, তপস্তার কি অভাব হইয়াছে, সাধনার কি শেষ হইতে বাকি আছে? হে ভারতের ঋষিপুত্রগণ! তোমরা কি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এই প্রথম জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ? তোমাদের অতীত জীবনের কঠোর তপস্তার কথা কি স্মরণ নাই? জগতের কোন্ দেশ তোমাদের মত ভগবৎ-লাভের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিয়াছে? তোমরা না করিয়াছ কি? স্থূল শরীরের সমগ্র মর্ম্মবোধের জন্য অতি কঠোর হঠযোগ হইতে জীবনের সূক্ষ্মশিল্প অবগত হইবার জন্য যাবতীয় সাধনই তোমরা একে একে অবলম্বন করিয়াছ—এখনও তাহার নিদর্শনস্বরূপ ভারতের কত সন্ন্যাসীর উৎকট তপশ্চরণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া গিরিকন্দরে, গভীর অরণ্যে বিদ্যমান্। তোমাদের মত ভগবৎ-তত্ত্ব-বোধের অধিকারী জগতে আর কে আছে? আত্মবিস্মৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত সাধনার, অতীত কর্ম্মেরই কেন পুনরানয়ন করিতে চাহিতেছ?

আজ আমরা মুক্ত, সমস্ত অনুষ্ঠানের পর আমরা বুঝিয়াছি ভগবান্ অনুষ্ঠেয় নহেন। আজ আমরা শুদ্ধ, সমস্ত সাধনসংস্কার ছাড়াইয়া সহজ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে শিখিয়াছি। একটা দৃঢ়বিশ্বাস জাগাইয়া আপনার দিকে চাও, দেখ তুমি নূতন নহ, তুমি বহু তপস্তার পর সিদ্ধির জন্য আজ পুণ্যতীর্থে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। আজ কোটী জন্মের গোলকধাঁধা কাটিয়া গিয়াছে—আমরা ভগবানের নিকটে থাকিয়াও সাধনার আড়ম্বরে তাঁহাকে এতদিন দেখি নাই, তাঁহাকে দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি। ওগো এই তিনি—এই সরল, এই সহজ, আমারই মত, তোমারই

মত প্রত্যেক ঘটে ঘটে লীলারত। এইখানে রামপ্রসাদের একখানা অমর সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া তোমাদের বুঝাই—

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্‌বো কি হাঁড়ি চাতরে?
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারীরে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে।
জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা কি অপরে?
রামপ্রসাদ বলে, বল্‌বো কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে।

বসন্ত-উৎসব

শীতের কুয়াসা কাটাইয়া দখিনের উন্মাদ বাতাস এক নূতন বার্ত্তা আনিয়াছে, মরজগৎ তাই শুনিবার জন্য নূতন সাজে আজ পথে দাঁড়াইয়া। সকল জড়তা ছাড়িয়া, সকল দীনতা ভুলিয়া জগতের সব বিটপীবল্লরী নবকিশলয়ে অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া বাহিরে আসিয়াছে, আলোকে বাতাসে মাখামাখি হইয়া নূতন বার্ত্তা শুনিতেছে।

সে মধুর বার্ত্তায় কি উন্মাদনা আছে, কি মাদকতা আছে, কি উৎসাহ আছে, যে তাহা শ্রবণে তাহাদের জীবন ভরিয়া উঠে, ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া নিজের ও বিশ্ববাসীর জীবন সার্থক করিয়া তুলে। লতাবিতানের কুঞ্জপ্রাঙ্গণে বসিয়া, যে বিহগটী প্রবাসের দুঃখ ভুলিয়া আজ মধুর স্বরে হাঁকিতেছে, সে বুঝি আজ ঐখানে

প্রাণের সুর খুঁজিয়া পাইয়াছে। সে সুর কি বাতাস সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, না লতাবিতানের প্রাণে সে নবীন সুর সুপ্ত ছিল?

সহকার-শাখা মুকুলিত, সুগন্ধে সারা দিক্‌ আমোদিত, এ স্বর্গের সুর মরতে কে আনিয়া দিল—যাহার ঘ্রাণে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, কি যেন একটা অভাবের কথা প্রাণে জাগিয়া উঠে! পাই, পাই, পাই না, সে তাজা সে প্রাণমাতান চিরসুন্দর সুরটী। সে সুরটী এই সুযোগে ধরিতে পারিলে একটা অবিচ্ছেদ অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া ফেলিতে পারি, সে সুরটী আলাপ করিতে পারিলে লতা পুষ্পে, আম্রমুকুল গোলাপের গন্ধে একটা মিলন ঘটিয়া যায়—চির নবীন, চির আনন্দ, চির স্বর্গের দুন্দুভি বাজাইয়া সমগ্র জগৎকে চিরদিন মাতাইয়া রাখিতে পারি।

সে সুর আমারই প্রাণের তাজা আনন্দবার্ত্তা। সে বার্ত্তা ভুলিয়া যাই দীনতায়, সে বার্ত্তা ভুলিয়া যাই অহঙ্কারে স্বার্থপরতায়। কিন্তু সে ত ভুলিবার নয়, অনুকূল বাতাসে সে জাগিয়া উঠে, আপনি বিকশিত হয়, আবার অবস্থার পীড়নে ঝরিয়া পড়ে, আমারই ভিতর সুপ্ত হইয়া থাকে।

আজ এই নবীন অনুকূল বাতাসে, এই মহা মাহেন্দ্রক্ষণে ঐ উদ্যানের পুষ্পবাটিকার মত আমি পাতায় ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিব, আমি ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ হইব। আমার জড়তা, আমার দীনতা, আমার নির্জ্জীবতা চিরদিনের নয়, কিছুক্ষণের বিশ্রামশয্যা।

আজ এই বসন্ত-উৎসবে সকলকেই যোগদান করিতে হইবে।

টান দিয়া ফেলিয়া দাও এতদিনের অলস শয্যাটাকে—এক নিঃশ্বাসে সমস্ত দুঃখহলাহলটাকে পান করিয়া অমৃতশ্বাস গ্রহণ কর—সমস্ত জীবন ভরিয়া উঠুক লাল, নীল, শ্বেত, পীত কুসুম-স্তবকে—তাহার অতুল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হউক সমস্ত পৃথিবী—তাহার স্বর্গীয় সৌরভে ভরিয়া উঠুক সমগ্র জগৎ। আনন্দে, উন্মাদনায় নাচিয়া উঠুক বসন্তের উৎসব-প্রাঙ্গণে, একই দেবতার চরণতলে, ধরণীর বিভিন্ন মানবজাতি।

আর বলিও না ইহা কিরূপে সম্ভব? কৃশ নির্জ্জীব বৃক্ষ যেমন করিয়া মুকুলিত হইল, ইহাও সেইরূপে হইবে।

কেবল বাহির হইয়া আইস নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বিশ্ব-মানব মহালীলার যন্ত্রস্বরূপ, পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। স্বামীজীর কথাটী এইখানে উদ্ধৃত করি "মনে রাখিও—তোমার স্ত্রী, তোমার জীবন, তোমার ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগের জন্য নয়; ভুলিও না—তুমি জন্মিয়াছ তোমার নিজের জন্য নয়, জননী জন্মভূমির জন্য।" আমরা এই পৃথিবীতে জন্মিয়াছি, পৃথিবীর কল্যাণ-সাধনেই আমাদের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

গতির পরিবর্ত্তন

আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া চমক হইল—এ কোথায় চলিয়াছি? যাহাকে জগতের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলাম, যাহার জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিলাম, যাহার জন্য নির্য্যাতন অপবাদ দারিদ্র্যকে অঙ্গের আভরণ করিলাম, সে যে জীবনবিহীন। এ গলিত শবকে লইয়া কি করিব? আজ ব্যর্থ প্রয়াসের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে মনে হইতেছে—সকলই বুঝি পণ্ড হইয়াছে! জীবনের পথে চলিতে চলিতে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই গতি-পরিবর্ত্তন করিতে হয়, আজ আমিও গতি-পরিবর্ত্তন করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। এতদিন যাহাকে বহিয়া চলিয়াছি, গতির আবেগে তাহার দিকে লক্ষ্য করি নাই, শবের ভীষণ বোঝা বহিয়া এক একবার ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের আশায় শীতল ছায়ায় আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু কে যেন আগে চল, আগে চল ভাই, বলিয়া আমায় চালাইয়া লইয়াছে। আজ যাহার জন্য এত শ্রম তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম—আমার বোঝা প্রাণহীন। কিন্তু এই বোঝাই আমার অবলম্বন, ইহা ব্যতীত আমার জীবন শূন্য—অতএব বোঝা চাই। ইহাকে বহিয়াই আমি মানবজন্ম সার্থক করিব। সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া এমনই আবেগে ত্রিপুরারি মহানৃত্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে নৃত্যে ধরাতল রসাতলে প্রবেশ করে বুঝিয়া শ্রীবিষ্ণু

শিবের চৈতন্য ফিরাইয়া আনিলেন। উমানাথ মোহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন—ফলে পার্ব্বতী নবজন্ম লাভ করিয়া মন্মথনাথের আনন্দবিধান করিলেন। আজ আমারও মোহ দূর হউক—শান্ত, সংযত হইয়া জীবনব্যাপী সাধনায়, আমার অবলম্বন, আমার সর্ব্বস্বের নবজীবন যাহাতে ফিরিয়া আসে, তাহার চেষ্টা করিব। সে এক নূতন চেষ্টা, সে এক নূতন পথ—ইহাই আমার গতির পরিবর্ত্তন।

আমারই তপস্যার দ্বারা আমি আমার সমাজের জীবন ফিরাইয়া আনিতে চাই—আমার শুদ্ধতা দিয়াই গলিত সমাজের অশুদ্ধতা দূর করিতে চাই—আমার জীবনীশক্তি দিয়া সমাজের নূতন জীবন গঠন করিতে চাই। চাই ইহাকে একেবারে নূতন করিয়া গঠন করিতে—শুধু পরিচ্ছদপরিবর্ত্তন করাইয়াই আমি নিশ্চিন্ত নহি—উমার মত ইহাকে আবার নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। নূতন জীবন, নূতন অবয়ব, নূতন বেশ দিয়া ইহাকে গড়িয়া তুলিব। ইহার জন্যই আজ আমি আমার গতির পরিবর্ত্তন করিতেছি।

আমিই এই আমূল পরিবর্ত্তনের মেরুদণ্ড। আমি অনাদি কাল হইতে ইহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, পাপপুণ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছি—ইহার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারই অনুরূপ আমার জীবন গঠন করিয়া তুলিয়াছি। আমি না হইলে আমার সমাজের নবজীবন কে আনিয়া দিবে? তাই আজ আমি ইহার জন্য উন্মাদ হইতে চাই—নদীয়ার ঠাকুর একদিন

যেমন প্রেম যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে বিলাইয়াছিলেন, আজ আমিও সঞ্জীবনী মন্ত্রশক্তি ঘরে ঘরে বিলাইব—গৌরাঙ্গের প্রেমের স্রোতে বাংলা একদিন ডুবিয়াছিল, আজ আমার মন্ত্রবলে বাংলাকে নবজীবন দান করিব।

সে আমার নূতনগতি, সে আমার নূতন পথ—তাই গতির পরিবর্ত্তন করিব বলিয়াছি। আমি আজ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকেই পুরোভাগে ধরিব—জড়শক্তির আশ্বাস পরিহার করিয়া ভগবৎ-শক্তির, আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব—কুটিল স্বার্থের পরিবর্ত্তে প্রেমমন্দাকিনীতে অবগাহন করিব। আজ আমি উন্মাদ হইব জ্ঞান শক্তি প্রেমে, আমি আমার দেশকে জাগাইয়া তুলিব, নাচাইয়া তুলিব, পাগল করিয়া তুলিব জ্ঞান শক্তি প্রেমে—আমার দেশ আমার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে, সে পৃথিবীর জ্বালা ভুলিয়া স্বর্গে পরিণত হইবে। আমরা দেবতার মত এই সোণার দেশকে মাথায় করিয়া নাচিব—আমাদের কথা সমগ্র জগৎকে শুনাইব—সে মর্ম্মভেদী মহাসত্য আগুনের মত চতুর্দ্দিক্ ছাইয়া ফেলিবে। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম জগতের জন্য, ইহাই প্রমাণ করিব—তাই আমার এই গতির পরিবর্ত্তন।

বাণী

আজ বাংলাদেশে যে সঙ্কোচ, যে অস্পষ্টতার ছায়া চতুর্দ্দিকে পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা শীঘ্রই অপসারিত না করিলে, আমরা যে আরও অন্ধকারে ডুবিয়া যাইব, ইহা ধ্রুব সত্য।

কিসের জন্য এতটা আত্মগোপন—কিসের জন্য বন্ধু বন্ধুকে সংশয়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করে—কিসের জন্য সহোদর সহোদরকে, পিতা পুত্রকে, প্রতিবাসী প্রতিবাসীকে বিশ্বাস করিতে পারে না? আজ এই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে যে অনুদারতা, যে সঙ্কুচিত ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহার আশু প্রতীকার করিতে হইবে।

বাংলার প্রতি কার্য্য আজ যেন সংশয়পূর্ণ, তার জীবনবিকাশের পথ যেন অবরুদ্ধ, সত্য গোপন করিয়া মিথ্যাময় জীবন যাপন করাই যেন তার ধর্ম্ম। হে বাঙ্গালী, একটা মস্ত মোহে তোমাদের এমনই বিপন্ন করিতেছে, একটা কুহক তোমাদের অপদার্থ করিয়া তুলিতেছে, একটা অকিঞ্চিৎকর ত্রাস তোমাদের জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছে। তোমরা সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্; তোমরা পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় স্বরূপ ফুটাইয়া তোল; সমস্ত অবসাদ দূরে অপসারিত করিয়া নির্ভীকচিত্তে হাঁকিয়া বল, —তুমি মঙ্গলময়, তোমাদ্বারা কাহারও অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা নাই।

তোমরা আজ জীবনধারণের জন্য মুষ্টিমেয় অন্নমাত্র সম্বল

করিয়া, লজ্জানিবারণকল্পে জীর্ণবস্ত্রটুকু কটিতটে জড়াইয়া, সোণার বাঙ্গলায় সেই দিব্যযুগ ফিরাইয়া আন—যে যুগে বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা ছিল—যে যুগে বাঙ্গালীর বীর্য্য ছিল, সাহস ছিল—যে যুগে বাঙ্গালী সরল, উদার, ধর্ম্মপরায়ণ ছিল—তোমাদেরই দ্বারা সে সুদিনের আগমন সম্ভব হইবে। সৎ-কর্ম্মে ভগবান্ সহায়; তোমরা শুদ্ধচিত্তে জন্মভূমিকে ভালবাসিবে; সেই ভালবাসার অভিব্যক্তিস্বরূপ যে বিকাশ তাহাতে স্বদেশের কল্যাণ হইবে—কে তাহার অন্তরায় হইবে বল?

আজ প্রতি বাঙ্গালীর বাসস্থান স্বর্গে পরিণত হউক, বাঙ্গালীর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দেবচরিত্র লাভ করুক; সর্ব্ব বাধা-বিপত্তি পদতলে দলিয়া বাঙ্গালী সত্য হউক, সুন্দর হউক; বাঙ্গালী বিকশিত হউক, পরিপূর্ণ হউক।

মা ভৈঃ

প্রকৃতি যখন উদাসীনা হন, তখন তাঁর প্রত্যেক যন্ত্রই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ফলে দেহ প্রাণ চিত্ত মন বুদ্ধি সমস্ত বিকৃত দশা প্রাপ্ত হয়। এই মূঢ় ভাবই জীবের বর্ত্তমান অবস্থা। এই অবস্থায় আমাদের সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খলাময় এবং জগতের প্রভূত অমঙ্গল-কারক।

সেই লোকই মনুষ্যজাতিকে ঊর্দ্ধপথে আনয়ন করে, যার

ভিতরে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়াছেন। এই শক্তি পুরুষের আহ্বানে জাগিয়া উঠেন। পুরুষ ত্রিলোক ছাড়িয়া সহস্রদলে অবস্থান করেন, প্রকৃতি মূলাধারে সুপ্তা, অবসাদগ্রস্তা, তাই দেহ প্রাণ মন যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবকে জন্ম জন্ম জন্মমরণের মধ্যে পরিক্রমণ করাইতেছে।

পুরুষ নির্ব্বিকার সদানন্দময় নিত্যচৈতন্যস্বরূপ। প্রকৃতি পুরুষের সেবিকা। এই পুরুষের ইচ্ছামাত্র প্রকৃতি তৎপরা। আজ ভাবময় ভগবান্ বাস্তব হইবার জন্য ভাবরাজ্য হইতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া জগতে অবতরণ করিবেন। ইহা তাঁহার ইচ্ছা, ইহা তাঁহার লীলা। তাই জগতের এত পরিবর্ত্তন। যে কুসংস্কারে, যে বিকৃতিতে ধরাতল অপরিচ্ছন্ন, প্রকৃতি সম্মার্জ্জনী দিয়া সে সমস্তই দূর করিয়া পুরুষের আগমন সম্ভব করিয়া তুলিবেন।

হে মানব! তোমার ত্রিলোক দেহ প্রাণ মন, আজ এই দেহ প্রাণ মনে ভগবান্ আগমন করিবেন, তাই এ সকলের উপর প্রকৃতির আঘাত পড়িয়াছে। এই আঘাতে তোমার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবে না, বরং তোমাকে নির্ম্মল ও অমৃতময় করিয়া তুলিবে। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হও। মা ভৈঃ।

আত্ম-তত্ত্ব

অধ্যাত্মযোগের দ্বারা জীবনটা যে স্বপ্ন নয় ইহা শীঘ্রই উপলব্ধ হইবে। এজীবনের মধ্যে যে সত্য আছে, সেই সত্যের প্রেরণায় আমাদের জীবন, ইহা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে হইবে এবং সত্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগদ্ধিতায় কার্য্য করিতে হইবে।

যখনং জীবনটা সত্য হইয়া উঠিবে, তখন দেখিবে জীবনের সকল যন্ত্র পুরুষের আয়ত্তাধীন, তখন পুরুষের ইচ্ছামতই প্রকৃতির হস্তে এ সমস্তের সমর্পণ প্রশস্ত, কেন না পুরুষ নির্ব্বিকার আনন্দময়, প্রকৃতিই সকলের নিয়ন্ত্রী।

পুরুষের কোন অহঙ্কার নাই, আজ পুরুষ স্ব-সৃজিত মায়াদ্বারা বিমূঢ়, তাই তিনি শরীরে, মনে, প্রকৃতিতে আবদ্ধ, এইরূপ মনে করিয়া নানা দ্বন্দ্ব ভোগ করিতেছেন, পরন্তু তিনি শুদ্ধ, মুক্ত, আনন্দময়।

জীবনের মধ্যে তিনটীর পার্থক্য দর্শন কর (১) পুরুষ (২) প্রকৃতি (৩) যন্ত্র। পুরুষ স্বরাট্, হিরণ্যগর্ভ। প্রকৃতি পরা ও অপরা শক্তি। যন্ত্র, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব-সমন্বিত ক্রীড়নক।

পরা—বিদ্যা, অপরা—অবিদ্যা বা মায়া। পুরুষ এই প্রকৃতির সাহায্যে ক্রীড়নক লইয়া খেলিতেছেন, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা কর। পুরুষ এক অখণ্ড হইলেও ইচ্ছা করিয়াই ত্রয়ী হইয়াছেন, সকলের মধ্যে একই ব্রহ্মের অস্তিত্ব বোধ করিয়াও, বিভিন্ন বস্তুর আনন্দ

উপভোগ কর, কেন না তুমি স্বয়ং পুরুষ, ভোক্তা। ভোগই তোমার ইচ্ছা। ভোগেই এই বৃহতের সৃষ্টি।

এই যে শরীরযন্ত্রের শীর্ষস্থানে ভাবময় ভগবান্ যন্ত্রারূঢ় হইয়া চিৎশক্তির সাহায্যে বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন—সেই ভোক্তাই তুমি; এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পশ্চাতে অবস্থান করিয়া যে পুরুষ জগতের সংস্পর্শে আসিয়া নানা লীলা প্রকটন করিতেছেন, সেই পুরুষই তুমি। এই যে কর্ম্মশক্তি, চেতনাশক্তি, ইহাও সেই পুরুষেরই ইচ্ছাসম্ভূতা কালীশক্তি।

আর এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এগুলি সেই পুরুষেরই নিত্যসৃষ্টি, নিত্যলীলার উপকরণ; সুতরাং জীবন স্বপ্ন নয়, মায়া বা ইন্দ্রজাল নয়; জীবন সত্য, শিব, সুন্দর; জীবন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল; জীবনরূপ ত্রিলোকও সেই নিত্যের সৃষ্টি, সতের সৃষ্টি, সত্যের সৃষ্টি।

অতএব হে প্রাণাধিক বন্ধুগণ, হে এক অদ্বৈত সুন্দর মানব, উদ্ভ্রান্তচিত্তে কিসের অন্বেষণ কর? আজ এই গোপনরহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার দিকে দৃষ্টিপাত কর—দেখ,

"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"

ধর্ম্ম

একজন উৎসাহী শিক্ষিত যুবককে বলিলাম, "ধর্ম্মজীবন লাভ কর, তবে উন্নতি করিতে পারিবে।" সে বলিল, "কোথায় ধর্ম্মশিক্ষা করিব? কে শিক্ষা দিবে?" আমি একজন নামজাদা সন্ন্যাসীর নাম করিলাম, যুবক নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "মাপ করুন মহাশয়, গেরুয়ার আবছায়ায় জীবন খোয়াইতে পারিব না —আমি চাই আত্মবিকাশ—ধর্ম্মের নামে সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইয়া জগতের একটা কোণে আশ্রয় লওয়া আমার কর্ম্ম নয়।"

আজ বাংলার শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্ম্ম অর্থে কি ইহাই দাঁড়াইয়াছে—ধর্ম্ম কি কতকগুলি বিধিনিষেধের মধ্যেই অবস্থিত—সাধন পথে চলিবার কতকগুলি অনিবার্য্য আচরণই কি ধর্ম্ম—কতকগুলি যৌগিক ক্রিয়াকলাপ কি ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি?

ধর্ম্ম ত কাহাকেও কিছু হইতে বঞ্চিত করে না—সে যে উদার, বিরাট্, অনন্ত ভুবনব্যাপী—সে যে মানুষের অক্ষমতাকে দূর করিয়া তাহাকে সকল ভোগে সামর্থ্যবান্ করিয়া তুলে—সে যে সকল প্রকার নীচতা, স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিয়া মানুষকে সরল, উদার ও মহৎ করিয়া তুলে—সে যে ভিতর হইতে মানুষের সত্তাটাকে বাহিরে আনিয়া ভগবানের জয় ঘোষণা করে—সে যে অনাদৃত যন্ত্রে নূতন তার জড়াইয়া কড়ী ও কোমলে ঝঙ্কার দিয়া, অখিল ভুবনকে জাগাইয়া তুলে—সে যে আধফোটা ফুলের সকল

পাপড়ি সযত্নে খুলিয়া দিয়া মধুরগন্ধে জগতের মাছিগুলিকে একত্র ডাকিয়া আনে। ধর্ম্ম অর্থে বঞ্চনা, কে বলিল? ধর্ম্ম মনুষ্য-জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতাই সম্পাদন করে।

এই ধর্ম্ম কি? ইহা যদি একটা ব্রতসাধনের মত কিছু হইত, অবশ্যই এই অমূল্য ধর্ম্মলাভের জন্য কোন্ মানুষ উহার সাধন না করিত? শাস্ত্রের কোনও একটা নিষেধবাক্য মান্য করিয়া চলা যদি ধর্ম্ম হইত, উহা অবশ্যই পালন করিয়া লোকে ধর্ম্মার্জ্জন করিত, একটা কৌপিন অথবা আল্‌খেল্লা পরিধান কিংবা কণ্টকবিদ্ধ আসনে শয়নাদিরূপ কোনও কঠোর বিধানের মধ্যে ধর্ম্ম যদি লুকাইয়া থাকিত, নিশ্চয় উহাকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য পৃথিবীর লোক উন্মাদ হইত; কেননা ভিতর হইতে এই ধর্ম্মের সন্ধানের জন্যই অন্তরপুরুষ অনবরত তাড়না করিতেছেন—এই ধর্ম্মলাভ আমাদের করিতেই হইবে।

হে ভারতের ঋষি! আজ জলদমন্দ্রে আকাশে তোমার বাণী বাজিয়া উঠুক, সমগ্র পৃথিবী শুনুক—ধর্ম্মলাভের জন্য যে আকুলতা তাহারই লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম একটা অনুভূতি, সেটা মানুষের ভিতর কি জানি কেমন করিয়া দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে—তার আলোয় জগৎ-রহস্যের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া ফেলিবার সঙ্কেতটা দৃষ্টিগোচর হয়, জীবনটা বাস্তব হইয়া উঠে—বাহ্যজগতের উপর মানুষের আধিপত্য করিবার অধিকারটা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সৃষ্টিধরের হাতের চক্রের মত সে অফুরন্ত ঘুরিয়াই আনন্দ পায়।

এই যে জাগ্রত জীবন্ত মানুষের জীবন—কোন্ দুষ্ট, কুহকের

ফাঁদে ফেলিয়া ইহাকে মথিত ও অলস করিয়া দিতে চায়? ধর্ম্ম-সাধনার লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার সীমা অতিক্রম করিয়া যে পুরুষ এই বাস্তবটাকে আঁকড়াইয়া পাইয়াছে, আমরা সেই সরল ও সহজকে আহ্বান করিতে চাই।

আমরা মানুষের হাতেগড়া বিকট ও আড়ম্বরবিশিষ্ট ধর্ম্মসাধনার যন্ত্রগুলিকে পরিহার করিতে চাই—আমরা ধর্ম্মলাভের জন্য মানুষের উদ্দাম চেষ্টার ভীষণ মূর্তিটাকে দূরে রাখিয়া, কেবল-অনাগত সেই সুন্দর ও মঙ্গলের আগমন-প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া বসিয়া থাকিতে চাই—চ্যুত পত্রের মর্ম্মরশব্দে তাঁহারই আগমন অনুমান করিয়া সেই দিকে বার বার ফিরিয়া চাহিব—আবার বারংবার হতাশ হইলেও একই সঙ্কল্প লইয়া তাঁর না আসা পর্য্যন্ত এমনই ভাবে বসিয়া থাকিব। বাড়াইয়া তুলিব আমার আকুলতা—সে এক করিয়া ফেলিবে আমার জীবনযন্ত্রটাকে। এমনই একতারা বাজাইয়া অনন্ত জীবন কাটাইয়া দিব--তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখিব—আমার সর্ব্বস্ব-রত্ন, নূপুর পায়ে পাটী পাটী করিয়া আসিতেছেন—আমার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া। সে যত বিলম্বেই হউক, শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে তাঁর অগ্রগতিই আমার জীবনের বিরাট্ আশা, সাধনার সম্পূর্ণ সার্থকতা।

মূল কথা

নবীন সাধকের মহা বিপদ্ এই, যে সে প্রতিপদে পুরাতনের ফাঁদে পড়িয়া যায়। এই নূতনযোগাবলম্বী সাধককে মনে রাখিতে হইবে, যে ক্রমবিকাশময়ী আত্মশক্তিই তাহাকে দেবতা করিয়া তুলিবে—বাহিরের প্রচলিত কোনরূপ ভাব বা সাধন-পন্থার অনুসরণ করিয়া সে চলিবে না।

মানুষের মনে যখনই ধর্মভাব জাগিয়া উঠে তখনই সে পুরাতন পন্থার অনুসরণ করে। ফলে চিত্রের পদ্মে ভ্রমর যেমন ভুলিয়া থাকে, সাধকও সেইরূপ সাধনার জালে জড়াইয়া আবার আড়ম্বরবিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মহামূল্য সময় নষ্ট করে।

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই যে চৈতন্য সাজিতে হইবে, শঙ্কর সাজিতে হইবে, বুদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ধর্ম্ম-লাভের জন্য নেড়ানেড়ীর মত যে বৈষ্ণবী কাড়িয়া, তন্ত্রসাধকের মত যে ভৈরবীগ্রহণ করিয়া শক্তিলাভ করিতে হইবে এমন কল্পনা যেন আত্মসমর্পণ-যোগীর মাথায় না আসে। আত্মসমর্পণযোগী বাহিরে কোনও প্রত্যাশা করিবে না। তাহাকে বুঝিতে হইবে, তাহার ভিতর হইতেই শক্তি জাগ্রত হইবে। প্রতীকরূপা কোনও রমণীর নিকট হইতে অথবা কোনও দেবতার আরাধনা করিয়া শক্তিলাভ করিব, এরূপ উঞ্ছবৃত্তি নবীন সাধক যেন অবলম্বন না করে।

মূল কথা

সাধক আপনার শক্তিবলে আপনি দাঁড়াইয়া উঠিবে। ভিক্ষা-বৃত্তি সে জানে না, ভগবানের সকল ঐশ্বর্য্যই তাহার ভিতর সুপ্ত আছে, ইহা সে অবিরত মনে রাখিবে। এই অসীমশক্তি লাভ করিয়া জলদমন্দ্রে সে জগতের লোককে বলিবে "উঠ, জাগ, শক্তি-লাভ কর।"

সাধক যেন আত্মবিস্মৃত না হয়, পুরাতন সাধনপদ্ধতি ছদ্ম-বেশে তাহাকে যেন ভুলাইয়া বিপথে লইয়া না যায়। যে মুহূর্ত্তে সে আত্মশক্তিতে আস্থাহীন হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া 'আমায় দাও' বলিয়া বৃথা লোকের দ্বারে দ্বারে তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। কোথায় কে ভিক্ষা করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে? "শক্ত্যাং ভগবতি চ শ্রদ্ধা"—ভগবান্ এবং তাঁহার শক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হও। এই শক্তি তোমারই। গুরু কেবল এই মন্ত্রই দিতে পারেন আর অধিক ক্ষমতা তাঁহার নাই। শক্তির সাধনা তোমাকেই করিতে হইবে, নতুবা তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

মনে রাখিবে, আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছ, তাহা ভগবৎ-শক্তির প্রেরণায়; ভবিষ্যতে যাহা করিবে তাহাও ঐশীশক্তির আকর্ষণে—তবে ভিক্ষুক সাজিতে যাইবে কেন? কেবল এই মহা-শক্তির অবাধ লীলার জন্য, আধারগুলি শুদ্ধ হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখ। সমতা না আসা পর্য্যন্ত কাহারও প্রতীক্ষা করিও না। কে তোমার সঙ্গী হইবে, কে হইবে না, সে চিন্তা তোমার কেন? তুমি চলিবে মহানন্দে আত্মনির্ভরতা সঙ্গে লইয়া; তোমার অটল

অচল ভাব লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বল তোমার সঙ্গী হইবে; তুমি অনাসক্তচিত্তে দৃঢ় তরুর মত অবস্থান করিবে। বনস্পতি কি কখনও কোন্ লতাটি তাহাকে আশ্রয় করিবে, তাহার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র ব্যাকুল হয়? যাহা করিতে আসিয়াছ তাহার শক্তি তোমার ভিতরেই সুপ্ত আছে। অজ্ঞানতা তোমায় অসমর্থ করিয়া তুলিতেছে। আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া দেখ—তুমিই শক্তি, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি—ইহার অধিক আর কি বলিব?

ঋতম্

দেহ, প্রাণ, মন—অহঙ্কারের বন্ধনে আবদ্ধ, তাই তাহারা স্বতন্ত্র, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র। "আমি দেহ" বলিলে এই বিশাল বিশ্বে কতটুকু হই, এই অনন্তকোটী মানব-সমুদ্রের মধ্যে একটা বুদ্বুদের লক্ষ অংশের এক অংশও নই। সেইরূপ প্রাণ, বাসনার বেড়া দিয়া জগতের অসীম প্রাণশক্তি হইতে আমায় বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমার বাসনা—বিশ্বরচয়িতার যে বাসনা আমার মত সংখ্যাতীত জীবের প্রাণকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—সেই অন্তহীন বিশ্ববাসনার মধ্যে তাহার স্থান নাই বলিলেও চলে। সেইরূপ আমার মন, অফুরন্ত বিশ্বসৌন্দর্য্যের সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দর্শন, স্পর্শন, বিচার কতটুকু করিতে পারে? সে কি এই অসীমকে যুগপৎ ধারণা করিতে পারে? এইজন্য ইহারা ক্ষুদ্র, ইহারা অপর্য্যাপ্ত; অনন্ত ভগবানের

আস্বাদ এই গণ্ডীবদ্ধ জীবন দিয়া করিয়া উঠা যায় না, তাই সাধনার আবশ্যক। যাহা দ্বারা আমি এই ভগবদাস্বাদ করিতে পারি, এই অশেষ দেবতাটিকে ধারণার মধ্যে আনিতে পারি, এইরূপ ভাবে প্রাণ, মন, দেহটিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যতই কৃতকার্য্য হইব ততই দেখিব, আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। প্রাণ বাসনার আবরণে জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে। চিত্ত ক্ষিপ্ত, এইজন্য ভগবানের উপর সহজে তাহার নির্ভরতা আসে না, সে চেষ্টা উদ্যম ও প্রবল প্রয়াসের দ্বারা সকল কর্ম্ম সংসাধন করিতে চায়; এই অস্থির-স্বভাব-হেতুও জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। বুদ্ধি, তর্ক যুক্তি কল্পনা প্রভৃতির সাহায্যে সত্যবস্তু অধিকার করিতে চায়; কিন্তু সত্য ইন্দ্রিয়াতীত—চিত্ত, বুদ্ধি, প্রাণের দ্বারাও ইহা অধিগম্য নহে; স্থতরাং জীব সত্য হইতে বঞ্চিত হয়। জ্ঞান-প্রকাশেই সত্যের পথ আবিষ্কৃত হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণ মন ও বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় **(passive)** করিতে পারিলেই আমরা সত্যজ্ঞান লাভ করিব এবং তখনই ভগবৎ-ইচ্ছাকেই জীবনের কেন্দ্রশক্তি বলিয়া স্বীকার করিব। এই অবস্থা লাভ হইলেই সাধনা শুধু কতকগুলি বাক্য মাত্র না হইয়া জীবনে সত্য হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এই ভগবৎ-ইচ্ছাকে জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিবার পথে স্বভাবের এই সত্যটী জীবনের সবখানি যখন ভরিয়া তুলে, অর্থাৎ এই সত্য দিয়া ভাঙ্গা মন, খণ্ড প্রাণ, ক্ষুদ্র দেহ যখন পূর্ণ ও নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে তখন ক্ষুদ্র প্রাণের বাসনায়, তুচ্ছ শরীরের ইসারায়, মনের উন্মাদনায় আর নাচি না—নাচি সত্যের

প্রেরণায়, কেননা তখন জীবনটাই আমার সত্যময়, সত্যের জন্যই তখন কর্ম্ম, ভোগ, প্রেম, জ্ঞান— নিজেকে তখন হারাইয়া ফেলি অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে, যেমন মিলাইয়া যায় এক ফোঁটা জল অনন্ত বারিধির গর্ভে। এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই আমি "ঋতম্"কে বুঝি, অখণ্ড পরিপূর্ণ ভগবৎ-প্রেরণার দ্বারাই তখন আমার শরীর-যন্ত্র পরিচালিত হয়, আমি আমার খণ্ডজীবন হারাইয়া জীবনকে ঋতপূর্ণ করিয়া তুলি। বৃহৎকে সম্মুখে রাখিলে এই সত্য ও ঋতকে বুঝিবার অধিক অবসর আসিবে। কোনও ক্ষুদ্র খণ্ডভাবের উপাসনা করিও না; জীবন অখণ্ড দেবতার লীলাভূমি, প্রাচীন ঋষিগণ এই দেবতার সত্তা দিয়া জীবন ভরিয়া তুলিয়াছিলেন, তাই তাঁরা "ঋতম্"কে বুঝিয়াছিলেন; আর আমরা ক্ষুদ্র জীবনের আকাঙ্খা ও আরামের জন্যই সকল কর্ম্ম করি, তাই আমরা ঋষির বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হই। জীবন যখন প্রকৃতই সত্য হইয়া উঠিবে, যখন 'দেবায় জন্মনে' এই জ্ঞান শুধু মনে রাখা নয়, জীবনময় ছড়াইয়া পড়িবে, তখনই দেখিবে দেবতার জন্য তোমার জীবন, তোমার কর্ম্ম, তোমার সাধনা, তখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঋতম্‌কে অধিকার করিবে, জীবনটা ঋতপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

মর্ম্মবেদনা

বাঙ্গালীর জীবন গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ। তার অতীতের স্মৃতিটুকু সুখের, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিবিড় আঁধারে সমাচ্ছন্ন। পৃথিবীর অপর সকল জাতির দারুণ দুর্দ্দিন আসিলেও তারা ভবিষ্যতে দুর্দ্দিন কাটাইয়া সুদিনের আশা করিতে পারে, কেননা তাহাদের সে বল আছে, সে পথ আছে, সে সাহস আছে, সে আশা আছে—কিন্তু হায় আমরা বলবুদ্ধিহীন, আশাভরসা-সহায়-সম্পত্তি-শূন্য একটা আধমরা জাতি, আমাদের হাত নাই, পথ নাই, বলবীর্য্য সহায়সম্বল কিছুই নাই; পৃথিবীর এই মহাপরিবর্ত্তনের যুগে আমাদের স্থান যে কোথায়, তাহা ভাবিতে বসিলে কুল কিনারা খুঁজিয়া পাই না। তবু ত ভাবিতে হয়, তবু ত মরিতে সাধ যায় না! এমন লাঞ্ছিত জীবন বহন করিয়া, এমন হাহাকার, পদে পদে বিভীষিকা, উৎকট অন্নচিন্তা মাথায় বহিয়া মরণের রঙ্গস্থলে, বাংলার ভীষণ শ্মশানে কি সুখে, কি আশায় বাঁচিয়া আছি বল ত? কোটী কোটী নরনারীর অর্দ্ধাশন অনশন স্মরণ কর, তার কি প্রতিকার করিতে পার তাহাও চিন্তা কর, তারপর বলত আমাদের বাঁচিয়া সুখ কি? নিদাঘের প্রচণ্ড আতপতাপে, পল্লীর খাল, নদী, নালা শুখাইয়া গেল, নিদারুণ পিপাসায় দেশবাসীর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল—কি করিতে পারিলাম বলত? বল ত বাংলাব্যাপী এই যে মন্বন্তর, এই যে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, মহামারীতে

দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—ইহার প্রতিবিধান করিবার কি সামর্থ্য আছে?

নাই, নাই, কিছুই করিবার নাই, সমুদ্রের সঙ্গে গোষ্পদের তুলনার মত দেশের ক্ষুদ্র চেষ্টা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে চেষ্টায় হৃদয় পুড়িয়া যায়, ঘৃতস্পর্শে আগুনের মত অভাব আরও বাড়িয়া উঠে, মর্ম্মবেদনায় কর্ম্মীকে উন্মাদ করিয়া তুলে। তবু মরি না কেন? তবু বাঁচিতে সাধ যায় কেন বল ত?

এই সেদিন প্রতাপশালী রুষ, জাপানের উন্নতিস্রোতঃ রুদ্ধ করিবার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় বসিয়া যখন অনল বর্ষণ করিল, জাপানী সে অনলে, পতঙ্গের মত দলে দলে ভস্মীভূত হইয়া কি আশায় জয়লাভ করিল বল ত? কত বীর সে আহবে প্রাণ দিল, কত ঐশ্বর্য্য জলস্রোতের মত অপচয় করিল, কিন্তু জাপানের আশা ছিল, এ বিপদে উত্তীর্ণ হইলে তাহার সুদিন আসিবে। আজ দেখ জাপান ধনসম্পদে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পথে আগুয়ান হইয়াছে, ভারতের পণ্যবিপণীতে জাপানজাত দ্রব্য থরে থরে শোভা পাইতেছে, ভারে ভারে রত্নরাজি অর্ণবপোত ভরিয়া জাপানী হাসিমুখে দেশে লইয়া চলিয়াছে; কেবল দেখ, আর মর্ম্মবেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর। তোমরাও মানুষ, কিন্তু তোমাদের কি আশা আছে বলত?

আজ য়ুরোপে যে ভীষণ সংগ্রাম—ইহার তলেও প্রতি জাতির একটা বিপুল আশা লুকান আছে; সকলেই নিশ্চয় জানে, একবার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেই অনতিকালপরেই

ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারিবে। এমন শক্তিও সকল জাতির মধ্যে আছে, রণক্লান্ত হইলেই সকলে যেমন ছিল আবার তেমনই হইবে, কিন্তু আমাদের কি আশা আছে বল? আমরা বাঁচিয়া আছি কেন? কোন্ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, রত্নাকারের মত অস্থি-চর্ম্ম সার করিয়া অমর রাম নাম জপ করিতেছি? কোন্ মহান্ কার্য্যের জন্য কঠোর প্রাণ বহন করিয়া কৃমিকীটের ন্যায় মৃত্তিকা-গর্ভে দিনযাপন করিতেছি?

আজ দীন দরিদ্র, রাজা মহারাজা, সাহিত্যিক কবি, সমাজ-হিতৈষী রাজনীতিক, সকলকেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের কি আশা আছে বল ত? ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটা বৎসর সুখে ভোগে অতিবাহন করা ব্যতীত আর কি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার তোমাদের সামর্থ্য আছে বল ত? বিদ্যার্থী যুবকমণ্ডলী, রক্তমুখী হইয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমপূর্ব্বক যে বিদ্যার্জ্জন করিতেছ, উহার পরিণামে তোমাদের কি উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবে উত্তর দাও ত?

উত্তর নাই, বাঙ্গালী যাহা করে কিছু না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, তাই; নতুবা বাঙ্গালীর কি আশা আছে? যাহা আছে তাহা ত আশা নয়—সে ত মরীচিকা, সে দিকে ধাবিত হইলে নিশ্চয় ব্যর্থ হইতে হয়।

তবুও ত আমরা বাঁচিয়া আছি! তাই আজ প্রাবৃটের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আকাশের তলে বসিয়া ভাবিতেছি—কেন আমরা মরি-য়াও না? কেন হিমালয়ের একখণ্ড প্রকাণ্ড শিলা আমাদের

চাপিয়া ধরিল না? কেন বঙ্গোপসাগরের একটা উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া আমাদের ভাসাইয়া লইল না? কেন শত শত বৎসরের মহামারীর কঠোর নিস্পেষণে আমাদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল না?

ভাবিতে গেলে সমস্ত বুক বেদনায় ভরিয়া যায়, গভীর মর্ম্ম-ব্যথায় হৃদয় আকুল হইয়া উঠে, তবুও সেই রুদ্ধ জীবনস্রোতে স্তব্ধ তপ্তশ্বাসের তলে তলেই সার্থকতার সন্ধান বর্ত্তমান, এই কথাই হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।

সে আজ বহুদিনের কথা—তখন বাংলার বুকে বেলুড় মঠের দৃঢ়ভিত্তি জাঁকিয়া বসে নাই—সূচনা চলিযাছে মাত্র—স্বামীজীর তিরোধানের ছয় মাস মাত্র বাকী ছিল—স্বর্গীয় উপাধ্যায় এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের বদনে যে বেদনার প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা বলি শুন।

স্বামীজী কলিকাতাস্থিত হাতুয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন। উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বামীজী কি ভাবিতেছেন? আসুন কলিকাতায় বেদান্তবিজ্ঞানের এক রোল তোলা যাউক।" স্বামী বিবেকানন্দ অতি কোমল বেদনাবিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"ভাই ভবানী! আমি আর বাঁচিব না, যাহাতে আমার মঠটী শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি, তাহারই জন্য ব্যস্ত আছি, আমার অবসর নাই।"

উপাধ্যায় বলেন, আহা সে স্বর কি বেদনাময়! ব্যথাপ্রপীড়িত কি করুণ একাগ্রতাপূর্ণ বাণী! এ কিসের ব্যথা, কার জন্য ব্যথা?

ভাই, এই ব্যথাটুকুই আজ আমাদের সম্বল—এই ব্যথাই আমাদের আশা। আমাদের প্রতিজনের হৃদয়ে এই ব্যথাটুকু জাগাইয়া তুলিতে পার? বৃথা চেষ্টা, আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক উত্তেজনা নয়, আজ এমনি করিয়া অন্তঃসারশূন্য হইলে চলিবে না—আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীর জীবনটা বেদনাপূর্ণ হউক, নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, জাতির ভবিষ্যচিন্তায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়মন আকুল হইয়া উঠুক।

স্বামীজীর হৃদয়বেদনায় আজ প্রতিজনের হৃদয় ভরাইয়া তুলিতে হইবে—স্বামীজীর মত সেই মর্ম্মবেদনায় মজিয়া থাকিতে হইলে নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, ক্ষুদ্র সংসারের চিন্তা পরিহার করিতে হইবে, কল্পনার জগৎ ছাড়িয়া মর্ত্ত্যের দুঃখ-হলাহল উমানাথ শঙ্করের মত আকণ্ঠ পান করিতে হইবে।

তারপর দেখিব—এই বেদনার মধ্য হইতে পথের আবিষ্কার হয় কি না—সমুদ্রমন্থন করিয়া যেমন অমৃত উঠিয়াছিল, তেমনি বাঙ্গালীর এই হৃদয়-সাগর মথিত করিয়া অমর-জীবন-লাভের উপায় পাওয়া যায় কি না?

যতদিন না তাহা হয়, যতদিন না ধরায় এই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, এই বেদনার সাড়া বুকের মধ্যে জাগ্রত রাখিতে হইবে। কিন্তু এই মর্ম্মবেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে গিয়া কোনই আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, স্বামীজীর গৈরিক বসন, স্বামীজীর মঠস্থাপন, স্বামীজীর মত সমুদ্রপারে বেদান্তপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনুকরণ করিও না—স্বামীজির শক্তির সাধনা কর,

তাঁহার মূল প্রকৃতি, তাঁহার ভাবের উপলব্ধি কর। অগ্রে উপায় নয়, অগ্রে ভাষা নয়, অগ্রে প্রচার নয়, সর্ব্বাগ্রে আপনার মধ্যে মহাভাবের উদ্বোধন কর—তাহার দ্যোতনা আপনা আপনি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তুলিবে।

প্রেমের কথা

আমরা লোককে, দেশকে, ভগবান্‌কে ভালবাসি সুখের আশায়, ভোগের আশায—কিন্তু প্রেমের পরীক্ষা দুঃখে। এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমাদের প্রেম, আমাদের পিরীতি মলামাটিশূন্য হইয়া খাঁটি হয়। যে প্রেমিক দুঃখের বজ্র-কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হয়, তার ভালবাসার মূল্য নাই; সে কামের হ্রদেই চিরদিন নিমগ্ন থাকে, স্বর্গের পারিজাতে তাহার অধিকার নাই।

ধর্ম্মকে ভালবাসিয়া, ভগবানের সহিত প্রেম করিয়া মহামতি খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন—আকাশের দিকে চাহিয়া প্রেমময় পরমপিতার প্রেম স্মরণ করিয়া মরণের দুঃখ ভুলিয়াছিলেন।

প্রেমের গতি ঊর্দ্ধমুখী, কাম নিরয়গামী। সংসারে প্রেমিক যাহারা তাহাদের সংখ্যা অতীব বিরল—অসাধারণ ব্যক্তি না হইলে প্রেমের অসাধারণ ব্রত কয়জন উদ্‌যাপন করিতে পারে?

ভারত-উপাখ্যানে রাজা হরিশ্চন্দ্র, শ্রীবৎস, নল প্রভৃতি রাজন্য-বৃন্দের দুঃখের কথা স্মরণ কর, সত্যের জন্য কি কঠোর শাস্তিই ইহারা ভোগ করিয়াছেন! শিবিরাজা স্বীয় শরীরের মাংস স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া দান করিয়াছিলেন—ক্ষুদ্র প্রাণীকে ভালবাসিতে গিয়াও কত ত্যাগ সহ্য করিতে হয়! তারপর বিশ্বপ্রেমোন্মত্ত বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতির অগ্নিপরীক্ষার কথা স্মরণ কর। রাজপুত্র পঞ্চবীর পাণ্ডুপুত্রগণের অরণ্যবাস, বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের নির্ব্বাসন প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি পড়িয়া স্বতঃই মনে হয়—সত্যানুরাগের, প্রেমের, ইহাই পুরস্কার।

তাই কৃষ্ণপ্রেম কহিতে গিয়া কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি,
সুখ দুঃখ দুটী ভাই ;
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

যে সুখের লাগিয়া পিরীতি করে, তাহাকে অবশ্যই ব্রতচ্যুত হইতে হয়, তাই বলিতেছিলাম মনুষ্যজীবন লইয়া প্রেমের জন্য অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইতে, সার্থক হইতে চায় কয়জন বল দেখি? যে দেশে সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, প্রেমের জন্য অসাধারণ লোকের অভ্যুত্থান হয়, সে দেশ ধন্য, তাহার মাটী স্বর্গাদপি গরীয়সী।

একা বাংলায় কত ঘটনায় সত্যানুরাগী মহাজনগণ হাসিমুখে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অমৃতত্বের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়া-

ছেন। প্রেমিক নিত্যানন্দের সেই প্রেমময় বাণী—

"মেরেছ কলসীর কণা,

তাই বলে কি প্রেম দিব না ?"

এখনও বাঙ্গালীর কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিয়া উজ্জ্বল দেবজীবনের আদর্শ জাগ্রত প্রস্ফুট করিয়া তুলিতেছে।

শুদ্ধি

একি বিপ্লব, একি পরিবর্ত্তন, একি বিপুল আলোড়ন! এ কোন্ অভাবনীয় যুগের মধ্য দিয়া জগৎখানা আজ চলিয়াছে! প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনে, চকিতা দামিনীর চপল নৃত্যের মধ্যে ঘোর রোলে অশনি-গর্জ্জন, দারুণ ঝটিকার পর ঝটিকা-ঝাপট, কড় কড় করাল কড়কাপাতের কর্ণবিদারক ধ্বনি—এইরূপ এককালে সহস্র শব্দে মুখরিতা অমাবস্যার কাল-রজনীর মত এ কোন্ প্রলয়-যুগ আজ এই মর্ত্ত্যজগতে অবতরণ করিরা বিশ্ববাসী মানবকে ভীত, চকিত, বিহ্বল, ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে!

তবুও, এই আবার ভাবিবার দিনও বটে। এই প্রলয়যুগ, এই শ্মশানকালীর তাণ্ডবনর্ত্তনের যুগ, এই বিক্ষোভের বিলোড়নের কাল—ইহাই আবার ধ্যানের দিন, ভাবুকের ভাবনার দিন, কর্ম্মীর ক্ষণিক কর্ম্মবিরতি করিয়া আদর্শের সহিত নিগূঢ়তর পরিচয়ের দিন। সাধকের পক্ষে এমন যুগও তাই মহানন্দের,

কারণ ভাবনার সুযোগ, প্রসারতা ঘটে, গভীর ধ্যানের প্রকৃষ্ট অবসর মিলে এমনি সুযোগেই—ভাবসাধনার, গীতোক্ত কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের যে উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণ ইহাই।

তাই বুঝি আজ করুণাময় বিধাতা বাঙ্গালীকে ডাকিতেছেন—তাঁহার সাধের তাঁহার চির-আদরের চিরপ্রিয় এই জাতিকে নানা ক্ষেত্রে, নানা কণ্ঠে, নানা প্রকারে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন "আজ তিষ্ঠ, আজ উপবিষ্ট হও ধ্যানাসনে, আজ হৃদয়ের রাজসিক উত্তেজনা প্রশমিত করিয়া, হিরণ্ময় কল্পনাজাল অপসারিত করিয়া, এই যে অন্তরের গুহার মধ্যে আমি সত্য সত্যই আছি, এস আমার কাছে, আমার কোলে, আমারই সহিত গভীরতর সম্মিলনে। অন্ধকারে পথ দেখাইব সে ত আমিই—সমস্ত দুর্ব্বলতা সরাইয়া শক্তি দিব সে ত আমিই—আমি যে তোমাকে ভবিষ্যদেবজীবনের প্রবর্ত্তক, দেবজাতিতে পরিণত করিতেই চাহিতেছি, উদ্যোগ করিতেছি। এস—শান্ত, সংযত, সমাহিত হইয়া, আজ বুঝ আমার দিব্য ইঙ্গিত, এস, জানিয়া লও আজ কোন্ নিগূঢ় কারণে, কোন্ অপূর্ব্ব উদ্দেশ্যের প্রেরণায়, জগতের এই তরঙ্গ-বিক্ষোভ উপস্থিত।"

ভাই বাঙ্গালী, নিখিলেশ্বরের এই ইঙ্গিত কি আজি শুনিবে না? এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণা করিবে না? জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবে না? এই দেব-ভূমিতে আজ যে মহাভাব অবতরণ করিয়াছে, তাহার আজ আত্মশুদ্ধির দিন—পুরাতন যাহা কিছু সংস্কার জীবনকে সমাবৃত, পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ

করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই উন্মোচন ও অপসারণ চলিয়াছে। জানিবে না, সেই ভাব-সংশুদ্ধিই আজ ঘটিতেছে—তাই বুদ্ধি মন, চিত্ত প্রাণ, দেহ ও সমগ্র জীবনে আজ এই আঘাতের পর আঘাত। ঘর্ষণে মার্জ্জনে যেমন ধাতুযন্ত্র সুপরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ হয়, আজ সেই মহাভাব, সেই মহাশক্তিও তেমনি আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন—আর জগন্ময় এই যে ঘোর পরিবর্ত্তন, উহা শুদ্ধ নিভৃত কোন্ জগৎ-কেন্দ্রে বিরাটের সেই আত্মশোধনেরই অভিব্যঞ্জনামাত্র।

ঈশ্বর-প্রণিধান

আজ সমগ্র বাঙ্গালীকে মুক্তির পথে ছুটিতে হইবে—তাহাদের আর অন্য পথ নাই। সুখ সৌভাগ্য স্বার্থ যাহাদের লক্ষ্য, তাহারাই অবিদ্যার কুহকে, ভোগলালসার মোহে ডুবিয়া মরিবে—বিধাতার দান দুঃখ আমাদের গতিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে—আমাদের শুদ্ধি মুক্তি দেবত্ব সন্নিকট।

সংশয়ী, আমাদের সরল সাধনপথকে চিরদিনই বক্র ও কুটিল দেখিবে, পাপী স্বার্থপর হীনচিত্ত জন আমাদের সকল কর্ম্মই দারুণ দুরভিসন্ধিপূর্ণ মনে করিবে, ক্ষতি নাই, ইহাই আমাদের জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষা। প্রশান্ত চিত্তে এই সকল উপেক্ষা করিয়া সত্যের পথে, দেবত্বের পথে আমাদের গতিকে

দ্রুত করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে আমাদের জীবনস্রোতঃ নিত্য, আমরা চলিয়াছি ভগবানের আহ্বানে, অকারণ উৎপাতের প্রতীকার-পরায়ণ হইয়া জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট করিব না। পাপীর দণ্ডবিধান ভগবানের হস্তে অর্পণ করিয়া সম্মুখের পথটুকু অতিবাহন করিব—করুণাময়ের বরাভয়হস্ত আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া অমরত্ব প্রদান করিবার জন্য উর্দ্ধে উত্তোলিত রহিয়াছে; হে সাধক! অগ্রসর হও।

ভগবানের পথ ঋজু, পুণ্যময়, আনন্দপ্রদ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির এ পথে অধিকার নাই; বিক্ষিপ্তচিত্ত শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া এ পথে আসিবার প্রযত্ন করিলেও আনন্দের আস্বাদ পায় না, কারণ শুদ্ধচিত্ত না হইলে এ পথে আরোহণ নিতান্ত দুরূহ। তাই বলি শুধু ধর্ম্মের লালসা করিলে কি হইবে? কর্ম্মনাশার তীরে অবিদ্যার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যস্রোতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অবগাহন কর—বিনা আয়াসে আনন্দধামে উপনীত হইবে।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই তিনটী ক্রিয়াযোগ। এই কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়, সাধনপথে চলিবার অধিকার-লাভ হয়। শাস্ত্রোক্ত বারব্রত নিয়মাদির পালনের নাম তপস্যা, প্রণবজপ বা জটিল শাস্ত্রমর্ম্মের অনুধ্যানেব নাম স্বাধ্যায়। দুইটীই কলির জীবের পক্ষে আয়াসসাধ্য, তাই একমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধান-রূপ ভেলায় আরোহণ করিয়া শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ঈশ্বর প্রণিধানই আত্মসমর্পণ। ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইলে ধীরে

ধীরে জীবের কর্ম্মাশয়স্থিত অফুরন্ত সংস্কারপুঞ্জ অগ্নিসংযোগে তুলারাশির মত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। যাহার সংস্কার নাই, তাহার সুখ কি, দুঃখ কি ? অভাব কি, অভিযোগ কি ? ধার্ম্মিক জন কখনই নিরানন্দ ভোগ করেন না। ধর্ম্মের মহিমাপ্রচার-মানসেই ভগবান্ ইচ্ছা করিয়া ধার্ম্মিককে যন্ত্রণারাশির মধ্যে নিক্ষেপ করেন; পরিণামে, সুবর্ণ অগ্নিসংযোগে যেমন বিমল ও বিশুদ্ধ হয়, ভগবদ্ভক্তও তদ্রূপ অলৌকিক প্রতিভায় ও অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়।

ভণ্ডের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ভণ্ডের ঐশ্বর্য্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইলেও উহা অনিত্য। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত কালচক্রে ভস্মাবৃত প্রভাহীন বহ্নির মত বোধ হইলেও একদিন সে উজ্জ্বল হইয়া সমগ্র জগতে আলোক বিতরণ করিবে। আজ আমরা, তাই, যাঁহারা ভগবান্‌কেই চাহেন, এরূপ বজ্রকঠিন সঙ্কল্পপরায়ণ জনগণকে আহ্বান করিতেছি—এস, এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন কালনিশায়, এক বিরাট্ ভাগবতমণ্ডলীর সৃষ্টি করি—যে মণ্ডলী এই মহাপ্রলয়ের দিনে বিধ্বস্ত জগদ্বাসীর জন্য শান্তি-নিকেতন রচনা করিবে।

ভারতের ব্রত

শক্তির তাড়িত-প্রবাহ সমগ্র পৃথিবীতে প্রকটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। কালচক্রে বর্ত্তমান জগৎ রজোগুণান্বিত, অতএব অনুকূল ইন্ধনে সংগ্রামবাসনা সকল জাতির মধ্যেই সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। ভোগবাসনাতেই মানুষের মধ্যে তীব্র রজোগুণের প্রকাশ হয়, জীবের অন্তঃপুরুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন হওয়ায় অশুদ্ধ রজোগুণ মানুষকে এমন রক্তপিপাসু করিয়া তুলিয়াছে। জগতের সকল জাতিই আজ স্ব স্ব স্বার্থসংসাধনে নিরত, জগতের রাজনৈতিক গগন গভীরতমসাচ্ছন্ন—দেখিতে দেখিতে ইউরোপের প্রায় সমুদয় বীরজাতিই মহা-আহবে যোগদান করিল, পৃথিবীর কয়েকটী মাত্র শক্তি নীরব রহিল—জানি না সুদূর ভবিষ্যতে জগতের পরিণতি কোথায় দাঁড়াইবে?

বৈদেশিক বা ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা হইতে আমরা বিরত থাকিব, আমরা কেবল দেখাইতে চাই, জগতের যে কর্ম্ম-দ্যোতনা এবং আধারভেদে তাহার যে বিকাশ, সে প্রবাহে ভারতবর্ষ কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। আমরা এ তত্ত্ব আধ্যাত্মিকভাবেই আলোচনা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমরা জানি, মানুষ ভগবানের হাতের যন্ত্র, সুতরাং সে যাহা করে তাহার মূল কারণ সেই ভগবৎ-প্রেরণাই। মানুষের যে বাসনা, মানুষের যে আবেগ, উহা ত ভগবানের প্রেরণা ছাড়া

আর কিছুই নহে ; তবে ঐ প্রেরণা যে চিত্ত এবং প্রাণ দিয়া ধারণা করি, ঐ চিত্ত এবং প্রাণ অশুদ্ধ থাকিলেই শক্তির ইচ্ছা বিকৃতাকারে দেখা দেয়—আধারভেদে ভগবানের একই ইষণা বিভিন্নাকাবে বিকশিত হয় মাত্র।

অহং-আশ্রিত মানুষের কর্ম্মাশয়ে ভগবানের শক্তি সঞ্চারিত হইবামাত্র, মানুষ সেই সুযোগে তাহার বাসনানুযায়ী কার্য্য করে ; যে সৌভাগ্যবান্ সে অকৃতকার্য্যতার মধ্যেও জ্ঞানের সন্ধান পায় —আর দুর্ভাগ্য সেই, যে বার বার বিফলমনোরথ হইয়াও এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয়।

আজ জগতে যে বিপুল কর্ম্মস্রোতঃ দেখা দিয়াছে, এই আবর্ত্তে পড়িয়াই জর্ম্মণী তাহার চিরবাঞ্ছিত ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল, কেন না জর্ম্মণজাতির আধাব এইভাবেই গঠিত হইয়াছিল। এইরূপে এই সুযোগে প্রত্যেক জাতিই তাহার বাসনানুযায়ী চরিতার্থতার মোহে হাবুডুবু খাইতেছে। আয়র্লণ্ড ও সামান্যমাত্র সুযোগ পাইয়াই ব্রিটিশসিংহের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া বসিল, গ্রীস এই কর্ম্মস্রোতকে উপেক্ষা করিয়া আজ সুরধুনী-স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র গজের মত ওলট পালট খাইতেছে ; জাপান ও আমেরিকা এই মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এত কথা বলিবার আবশ্যকতা এই, যে, ভগবানের ইচ্ছাস্রোতকে বাধা দিতে কেহই পারিবে না ; প্রবল বন্যায় যেমন সকল নদীনালা ডুবিয়া যায়, আজ জগতের সর্ব্বঘটে মায়ের লীলা আধারভেদে বিভিন্নরূপে বিকশিত হইবেই।

সনাতনধর্ম্মী হিন্দু ! আজ তোমাদেরও নিষ্কৃতি নাই, তোমাদের ভাঙ্গাফুটা আধারগুলিও এই নবীন প্রবাহে পূর্ণ হইবে, তাই আজ নূতন বার্ত্তা শুনাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছি।

যখন বিশ্বের কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়াছেন, তখন আর উপায় নাই; সে শক্তির তীব্র বেগ আমাদের জীর্ণ আধার ভেদ করিবেই, অতএব হে সাধক, এই শুভযোগ যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তাহার আয়োজন আমাদের করিতেই হইবে।

উদাহরণস্বরূপ আজ সমগ্র ভারতের দিকে লক্ষ্য কর—দেখ সকলের প্রাণে এক নূতন আশা, এক নূতন আকাঙ্খার উদয় হইয়াছে; সে নূতন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া নানা জন নানা কার্য্যে জীবনমরণ পণ করিয়াছে। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি বলিয়াই, প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটীশের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস করিতেছে শুনিয়া যেমন আমরা চমৎকৃত হই নাই, আবার মিলিত রাজশক্তির সাহায্যার্থ কয়েকজন বাঙ্গালী-যুবক যুদ্ধ-যাত্রায় চলিয়াছে দেখিয়াও সেইরূপ আমরা বিস্মিত হই নাই। ভারতেও আধারভেদে বিভিন্ন প্রকাশের সৃষ্টি হইবে—সে ত সম্ভব অসম্ভব দেখিবে না—তুমি বাসনামুক্ত হও আর না'ই হও, এই যে বিপুল কর্ম্মোন্মাদনা, ইহা তোমার ভিতর প্রবেশ করিবেই।

কিন্তু কথা হইতেছে, ভগবানের এই সার্ব্বভৌমিক মহাশক্তির বিকাশ জীবের প্রবৃত্তি-অনুযায়ী বিকশিত হইবে। আজ ভারতবর্ষ-ও যদি কোনও বিশিষ্ট প্রবৃত্তির দাস হইয়া থাকে, তবে তাহাকেও তদনুযায়ী হইয়া উঠিতে হইবে, এবং সেই প্রবৃত্তি যদি শুদ্ধা না

হয়, তবে অতি অসম্পূর্ণ কার্য্যই প্রসব করিবে।

তাই আজ আমাদের শুদ্ধ হইতে হইবে, আমরা আবেগ এবং বাসনার উত্তেজনায় অটল থাকিব। কালীর ইচ্ছা যতই শুদ্ধ হউক না কেন, ইহা যদি বাসনা এবং আবেগের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার একমাত্র পথ পায়, তবে চিরকালই আমাদিগকে অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। সেইজন্য মা আজ আমাদের চিত্ত এবং প্রাণকে যোগসাধনায় পরিশুদ্ধ করিবার জন্যই সর্ব্বাগ্রে উন্মুখ হইয়াছেন—তপস্যায় বিশুদ্ধ হইয়া আমরা মায়েরই অঙ্গুলী-সঙ্কেতে কার্য্য করিতে চাই।

আমরা আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দকে লীলা ছাড়িয়া যোগাবলম্বন করিতে আহ্বান করি—লীলাই প্রকাশ—যোগের দ্বারা ভগবানের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলন-সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিলে খণ্ড-লীলাই বারম্বার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; কিন্তু ভারত যদি খণ্ড-লীলার নিকেতন হইত, তাহা হইলে কলির প্রারম্ভে পূর্ণব্রহ্ম শ্রী-কৃষ্ণের অভ্যুত্থান হইত না, ক্ষুদ্র ঐশ্বর্য্যলাভে উন্মত্ত হইয়া আবেগ-ভরে ক্ষুদ্রত্বের বিকাশহেতু গীতার বাণী প্রচারিত হয় নাই—গীতার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অথবা দেবত্ব লাভ করিতে হইবে। আজ যে বিপুল কর্ম্মপ্রবাহে সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত, সেই প্লাবন আমাদের উপর দিয়াও প্রবাহিত হইবে—আমরা এই দৈবী-শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া, যে ক্ষুদ্রতায়, যে নীচতায়, যে দীনতায় শত শত বৎসর অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছি, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাই। আমরা এই সুযোগে

আমাদের ক্ষুদ্র বাসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব না হই—ভারতবর্ষের মর্ম্মস্থলে ভগবান্ পূর্ণজীবনের যে নবীন অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করিতেছেন—আমাদিগকে তাহারই সমীপে দেহ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে—তবেই আমরা ভবিষ্য বিশ্বজীবনে আমাদের যে উদার, মহান্, পবিত্র দেয় অংশ আছে, তাহা বিতরণ করিবার যোগ্যতা উপার্জ্জন করিতে পারিব।

দুর্গোৎসব

বাংলার শোচনীয় দরিদ্রতা-নিবন্ধনই হউক, অথবা কালপ্রভাবেই হউক, মূর্ত্তিপূজার হ্রাস হইয়াছে। বৃদ্ধগণ এই শারদীয়া মহোৎসবের সময়ে প্রায় দুঃখ প্রকাশ করেন; তাঁহারা সেকালে প্রতি গৃহে কাত্যায়ণীর পূজা দেখিয়াছেন, আর আজ ঢাকের বাজনাও কর্ণগোচর হয় না—ইহা যে অধঃপতনের একটী বিশেষ লক্ষণ একথাও তাঁহারা দৃঢ়স্বরে কহিয়া থাকেন।

এই দুর্গোৎসব জিনিষটা কি? অসুরনাশিনী, সিংহবাহিনী, দশভূজার মৃণ্ময়মূর্ত্তির পূজা ত বহুদিন করিয়া আসিতেছি—মা প্রকট হইলেন কৈ? শারদীয়া মহাপূজায় সপ্তকোটী বাঙ্গালী জ্ঞানে অজ্ঞানে সপ্তকোটী কণ্ঠে মা মা বলিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে, কিন্তু মায়ের আসন টলিয়াছে কি? মা সেই অচেতন মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপ দিবসত্রয় আলো

করিয়া দশমীর দিন বিসর্জ্জিত হইয়া থাকেন—ইহাই বাঙ্গালীর মামূলী দুর্গোৎসব।

সে কোন্ অনাদিকালে—যখন দেবগণ ব্রহ্মশক্তিসমন্বিত হইয়া আত্মবিস্মৃত, অহঙ্কারে সনাতন পুরুষকে ভুলিতে বসিয়াছিলেন—ব্রহ্ম তখন তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি অপহরণ করিয়া সত্যজ্ঞান প্রদান করিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে বহুশোভমানা স্ত্রী-রূপিণী হৈমবতী মার মধ্য দিয়াই অন্তঃপুরুষের পুনঃ-পরিচয় পাইয়াছিলেন।

তারপর যুগে যুগে দেবগণ যখনই আত্মবিস্মৃত হন, তখনই শক্তিহারা হইয়া অশেষ ক্লেশের পর এই আত্মশক্তিরই উদ্বোধন করেন এবং এই আত্মশক্তির উন্মেষেই বিপন্মুক্ত হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

এই সনাতন লীলাই যুগে যুগে প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। দুর্গাসুর, ত্রিপুরাসুর, মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ অসুরগণ যখনই দেবদর্প চূর্ণ করিয়াছে, তখনই দেবগণ শক্তি আরাধনা করিয়া মহাদুর্গার অবতারণা করিয়াছেন এবং এই শক্তি বার বার আবির্ভূতা হইয়া দেবগণের দুর্গতি দূর করিয়াছেন।

এই জন্যই—

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারঃ বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্ন-বচনোগশ্চ পাপঘ্ন-বাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তারপর নরলোকে মহারাজ সুরথ এই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া সর্ব্বার্থ সফলকাম হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও রাবণ-নিধন-কল্পে এই মহাশক্তিরই আবাহন করিয়াছিলেন। আর আজ আমরা বাঙ্গালীও সেই মহাদুর্গার দশ হাতে দশ আয়ুধ প্রদান করিয়া প্রতি বৎসর মহাকালীর পূজা করিয়া থাকি।

ইহাই মহাপূজার আদি কথা। ফলতঃ মহাশক্তির আরাধনা না করিলে জীবের ব্রহ্মদর্শন হয় না, পরমানন্দলাভ ঘটে না, কিন্তু বেদান্তের দেশ এতকাল এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

আমরা যেমন জড়, তেমনি বীর্য্যহীন, যেমন জীবন্মৃত, তেমনি খড়কুটার এক প্রতীক নির্ম্মাণ করিয়া তিনদিন হো হো করিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাই, বিসর্জ্জনের দিন সিদ্ধির নেশায় ভোরপুর হইয়া পূজার সব রসটুকু উপভোগ করি। ছি! ছি! এমন করিয়াই কি মহাশক্তির অবমাননা করিতে হয়! এমন করিয়াই কি জগদ্ধাত্রী মহামায়াকে উপেক্ষা করিতে হয়! হে বাঙ্গালী! শক্তি-উপাসনার কেন্দ্রভূমি ভারতবর্ষ, কিন্তু একবার চাহিয়া দেখ দেখি—মহাশক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পার নাই বলিয়া গ্রহচক্রে আজ তোমার কেমন দুর্দ্দশা! তুমি দুর্গোৎসব কর, মহাশক্তির পূজা কর, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণার আরাধনা কর,—বাঙ্গালীর "বারমাসে তের পার্ব্বণ" মহাশক্তির উপাসনামাত্র। কিন্তু তোমার পূজা এমন কেন? শত শত বাঙ্গালী-যুবকের মধ্যে ২২৮ জন মাত্র বীরদেহ খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য

কেন? কেন যুবকবয়সে যৌবনোচিত শ্রী নাই, কেন বাহুযুগল শক্তিহীন, মস্তিষ্ক মেধাহীন? যে জাতি পুরুষানুক্রমে শক্তির সন্তান, শক্তিই যাহাদের উপাস্যদেবতা—তাহাদের এমন দুরবস্থা দেখিলে লোকে তোমাদের পূজাপার্ব্বণে বীতশ্রদ্ধ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মা বীণাপাণি! সাধনার ধনকে যে উঞ্ছবৃত্তি নরাধম জীবিকার্জ্জনের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া নে। যে ব্রহ্মমন্ত্র ভাষাকারে ইন্দ্রিয়গ্রাম দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিবে, সে ভাষা আজ লাঞ্ছিত, নিপীড়িত; যজ্ঞের হবিঃ সারমেয়ের অধিকারে। আর কেন মা! খুলিয়া দে জ্ঞানের কপাট, সাতকোটী বাঙ্গালী হুহুঙ্কারে আকাশ কাঁপাইয়া বলিয়া উঠুক—মা! মা! মা!

আজ আমরা মায়ের দেউলে উপনীত হইয়াছি—এবার আমরা যথার্থভাবে দুর্গোৎসব করিতে চাই। এবার পূজার অবসরে কোনও বাঙ্গালী অসার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আত্মস্থা মহাপ্রকৃতিকে বিস্মৃত হইবে না—এবার ষষ্ঠ্যাদিকল্প যথারীতি সম্পাদনপূর্ব্বক তিন দিন মহাশক্তির ধ্যান করিতে হইবে—সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গের নিম্নে যেমন প্রশান্ত জলস্তর, সাধককেও সেইরূপ বাহির ছাড়িয়া অন্তর মধ্যে এই শান্ত ফল্গুপ্রবাহ অন্বেষণ করিতে হইবে। যে মহাস্রোতঃ বাহির ভেদ করিয়া জগতে স্বর্গরাজ্যের মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিতে উন্মুখ, তাহাতেই সাধক যাহাতে গা ভাসাইয়া দিতে পারে তাহারই আয়োজন করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত দুর্গোৎ-

সব। তারপর দশমীর দিন মাথা তুলিয়া দেখিও, যে, জগদ্-রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—মাংসপেশী সবল; প্রাণ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ধৃতিশক্তিসম্পন্ন—তখন বাহির হইও—মুক্ত, শুদ্ধ, সিদ্ধ সাধক, সাতকোটী ভাই বোনের মুখে মিষ্টান্ন দিবার জন্য—আলিঙ্গন-পাশে আপনাপন স্বরূপকে হৃদয়ে মিশাইবার জন্য। আর হাঁকিয়া বলিও—

শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্য-দানব-দর্পহাম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্॥

কালী-পূজা

মানুষের সমস্ত জীবন এমন একটা প্রহেলিকাপূর্ণ যে সামান্যমাত্র চৈতন্যবিকাশ ঘটিলে নিজেকে নিজের চক্ষেই একটা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আমি কি বল দেখি? পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আমার ভিতর আছে, সহস্রবার জানিয়াও বাহিরের তুচ্ছ সম্পদে প্রলুব্ধ হইয়া পড়ি, পদে পদে ভ্রম ধরা পড়িতেছে, পদে পদে সামলাইতেছি; এমন সামলাইয়া চলিব কয় দিন? ছাড়িয়া দিলাম আমার সমস্তখানিকে অনন্তের অন্ধকার কোলে; লোকলজ্জা, উৎপীড়ন, যাহাই অদৃষ্টে থাক, সামলাইয়া চলার ধার আর ধারিব না!

বুঝিয়া দেখ তোমাদের যোগে কি বলে? ধ্রুব সত্য কি?

এই যে নাম রূপ লইয়া একটা কিম্ভূত কিমাকার হাড়মাসের খাঁচা বহিয়া বেড়াইতেছ—এটারও একটা সার্থকতা আছে; এই যে সার্থকতা, এটা কার, তোমার না ভগবানের? ভগবানের আবার সার্থকতা কি? তুমি বুঝিবে, যে, এটা ভগবানের ইচ্ছায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাঁর ইচ্ছাতেই চলিতেছে ফিরিতেছে এবং তাঁর ইচ্ছাতেই একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবে—এই বোঝা'ই তোমার সার্থকতা, এই জ্ঞানই অহং ছাড়াইয়া পরম পুরুষে পৌছান।

তোমরা ভাব, তোমরা কেন, আমিও ভাবি, এটা আমার—অথচ এই সামান্য নশ্বর সম্পত্তিটুকু সামলাইবার ক্ষমতাটুকু আমার নাই, আজ সর্দ্দি, কাল কাশি, পরশু ম্যালেরিয়া নিউমোনিয়া কত কি? আমি দেখিয়াছি, ভাবিতে ভাবিতে সব হাওয়া হইয়া যায়, পুঞ্জীভূত ভৌতিক কলুষ ধ্বংস হইয়া যায়, এই এত ভারী হাড়মাসগুলা তুলার মত লঘু হইয়া যায়, তখন কি আনন্দ! দুনিয়াটা ফিকে হইয়া চোখের সাম্নে পেঁজা তুলার মত বাতাসে ভাসিতে থাকে, আর আমি স্বয়ম্ভুর মত বসিয়া বসিয়া বায়স্কোপ দেখি—এইটাই আনন্দ। পৃথিবীর পরপারে বসিয়া রগড় দেখা—ভগবান্ বলিয়া অসাধারণ অপূর্ব্ব একজন আছেন, তিনি দিবানিশি এইই করিতেছেন। তাই চতুর্দ্দশ ভুবনে তিনি আছেনও বটে এবং নাইও বটে।

সব হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়, আমার বলিতে কিছু না রাখা। সঙ্কল্পের আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তুমি যেদিন হইতে ইহা ভাবিতে সুরু করিবে, দেখিবে, ক্রমশঃ সত্য জিনিষটা বাহির হইয়া

পড়িতেছে। তোমার কি আছে বল দেখি? এও কি বলিয়া দিতে হইবে, যে তোমার কিছুই নাই! দয়াময় সে এই জন্য, যে, আমার কিছু নাই বলিতে স্থরু করিলেই সব ভোগ আমার চলিয়া যায় না, সে মনের সঙ্গে মিল করিয়া যায়। যখন যে ভোগটা কিছু নয় ভিতর হইতে বোধ হয়, তখনই সে ভোগটা ফিকে হইয়া ম্যাজিক পর্দ্দায় মিলাইয়া যায়। মুখে বলিলেই ত তোমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, অথচ বলিতে বলিতে ভেজাল আপনি কাটিয়া যায়; তোমার কিছু নাই—জ্ঞানদাতা গুরুই সর্ব্বস্ব—শিবং স্থন্দরং মঙ্গলং আনন্দম্।

পৃথিবীর চারিদিকে যে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে, এটা কালীশক্তির একটা খেলা। কুরুক্ষেত্রে যদি পুরাতন ক্ষত্রিয়শক্তি একেবারে লুপ্ত না হইত, ভারতবর্ষ এতটা সাধনার অবসর পাইত না। ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে আজ যে সমরানলের আরম্ভ মাত্র, তাহাতে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধশক্তি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে—ইহার ভিতরেও মানুষের হাত খুব কমই দেখিতে পাইবে, সব তাঁর ইচ্ছা, এই ইচ্ছার বশবর্ত্তিতায় মানুষের যাহা কিছু চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আজ আমার অনেক কথা মনে আসিতেছে—অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ—কেবল হৈ হৈ করিয়া আমরা বেড়াইতে শিখিয়াছি, দুইদণ্ড চুপ করিয়া আজিকার দিনটাকে উপভোগ করিবার অনুষ্ঠান ত আমরা করিলাম না। তোমরা, তোমরা বলিলে যদি অহঙ্কারে আঘাত পড়ে, আমরা বলিয়াই বলি, আমরা একটু ফিকে মারিয়া যাইতেছি। সপ্তাহে বড় ঘড়িকে দম দিয়া দিলে সারা সপ্তাহ

সে টিক্ টিক্ করিয়া চলে, তোমরা ত ঘড়ি নও, যন্ত্র নও, যে দম লইয়া একঝোঁকে কিছুদিন কাটাইয়া দিবে—তোমরা এক একটা শক্তির ডেলা—কালীপূজার রাত্রে বিশ্বশক্তির গুপ্তমন্দিরে যে লীলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তার ছোটখাট তরঙ্গও যে তোমাদের আঘাত করে নাই এমন নহে—তবে অঘোরে রহিলে, বুঝিলে না। শক্তির তরঙ্গ জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, ঘুমাইলে কি ছাই বুঝিবে !

কর্ম্ম ত আছেই, সেটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত পৃথিবী জুড়িয়া বসিয়া আছে, একচুল এধার ওধার হইলে তার ছড়ির আঘাতে আমাদের পিঠে গভীর দাগ পড়িয়া যায়, পেয়াদায় বাবা বলায় ; তবে তুমি কাজের পিঠে যে শীলমোহরের ছাপটা লাগাইয়া দিতেছ, আমি হয় ত সেটা দিই না, এই মাত্র ! মোটামুটি কাজ সকলেই করিতেছে, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভাবের সাধনাই মধুময়, অভিনব, মনোরম। এই মনোরম ভাবটীকে মজ্জাগত করিয়া লইতে পারিলে, তখন সুযোগ আর তোমাদের ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না—ঢাক ঢোলের বাজনার তুমুল আওয়াজের মধ্যে মন প্রাণ এক হইয়া যাইবে—দেখিবে সন্ধিপূজার মহামন্ত্র জীবনময় ছড়াইয়া পড়িতেছে, তুমি মন্ত্রময়, ভাবময়, মধুময়—বিশ্বের অজস্র কোলাহল তোমার বাহিরে পড়িয়া হামাগুড়ি দিতেছে।

আমাদের নিজের হাতে গড়া ফুলের বাগানে যে ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, তার সবটুকু আহরণ করিয়া এক মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে—সেটা হইতে হইতে হইতেছে না, যখন হইতেছে

না তার উপর কথা নাই, কালী শক্তি না দিলে, জ্ঞান না দিলে হইবে না জানি, কিন্তু আজ মায়ের মন্দির সবার কাছে উন্মুক্ত —ওগো তোমরা কোথায়, একটু গভীর ভাবের অভাবে আজ এ সাধনা হইতে বঞ্চিত হইলে, আজিকার মহানিশি তোমাদের কাছে ব্যর্থ হইবে।

নাম রূপ লইয়া আমরা মজিয়া আছি—এটা যে স্বাভাবিক। স্ত্রীপুত্র, ভ্রাতাভগ্নী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, এসবই নামরূপ-ধারী—এঁদের লইয়া কতজন্ম কাটাইয়া আসিয়াছি, আজও কাটাই-তেছি। আহার, বিহার, ভোজন, শয়ন, এসবেও মজিয়া আছি, থাকিব এবং থাকিতেও পারি ; অসংখ্য নামরূপের মাধুর্য্যে ডুবিয়া, মজিয়া, কোটী জন্ম কাটাইয়া দিলাম—একদিনের জন্য ঐ সব ছাড়িয়া যাকে দেখা যায় না, যাকে জানা যায় না, যাকে প্রমাণ যুক্তির বিষয়ীভূত করা যায় না, অথচ যে আছে, যে সব, যে সকলের অতীত, তার ভাবনা করিতে সাধ যায় না।

বড় কঠোর, বড় নীরস, বড় বিকট। হাঁ, কালী লোলরসনা, বিকটদশনা, মহাভীষণা। তুমি নামরূপ চাও, তাই এই রূপই তোমার সম্মুখে আনিয়া দিয়াছি, ডুবিয়া যাও, দেখিবে মায়ের রূপ অতুলনীয়, পৃথিবীর কোথাও এ'র তুলনা নাই—হয়ত তিনি রূপা-তীতা, এমনি গুণাতীতা অথচ মহামহিমান্বিতা, সর্ব্বশক্তিশালিনী সকল সম্পদশালিনী আদ্যাশক্তি। যা কিছু সবই তাঁর, তিনি ছাড়া কিছু নাই, দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যাইবে, তোমার অভ্যাসগত সমস্ত নামরূপ এই অপূর্ব্ব অসীমত্বে মিশাইয়া যাইবে, তোমার

সকল প্রবৃত্তি এই অপার্থিব মহানন্দসাগরে ডুবিয়া যাইবে। যদি ভক্ত হও, যদি সন্তান হও, নূতন জীবন পাইবে; পৃথিবীর রূপ তোমার কাছে বদলাইয়া যাইবে, দেখিবে কেবল চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি—আর কিছু নাই। যখন জীবভাব, তুমি তখন ক্ষুদ্র, খণ্ডিত, বদ্ধ, আর যখন ভাবময়, কেবল শক্তি, কেবল শক্তি, অফুরন্ত শক্তি, বিশ্ব-তোলপাড়-করা শক্তি, অদম্য অপরাজেয় শক্তি, আর আনন্দ, সবেতেই আনন্দ, মায়ের যেমন মুখভরা হাসি, অসুরদলনেও মা আমার স্মিতবদনা, প্রফুল্ল-আননা—তুমিও তেমনি। উঃ, সে কি আনন্দ—লজ্জা নাই, ভয় নাই, মোহ নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই—তুমিই শিব, তুমিই কালী, সাকার নিরাকার, অরূপ রূপময়, সান্ত ও অনন্ত, আবার তুমিই সুখদুঃখ, বিপদ্ সম্পদ্, জীবন মৃত্যু, সে অপূর্ব্ব মহালীলা যাহা জগতে তাহা তোমাতে—তুমি মা, মা তুমি—সব ভরিয়া উঠিবে তোমার আনন্দে, তোমার প্রীতিতে—তুমি বিভূতিময়, তোমার বিভূতিতেই জগৎ-প্রকাশ—তুমি জ্ঞানাতীত আবার জ্ঞান-প্রকাশ, এ কেবল কালী-সাধনায় হইবে, তন্ত্রের সাধনায় হইবে, কলিযুগের ইহাই যুগধর্ম্ম।

ব্যাধি কোথায় ?

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্"। সত্য সত্যই আর্থিক সাচ্ছন্দ্য মানুষকে একেবারে অপদার্থ করিয়া তুলে। ধনবান্ কি কখনও "জগদ্ধিতায়" আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বাহির হইতে পারিয়াছে? তবে যে তাহারা কিছু করে, সে কেবল মান যশের আশায়, পদমর্য্যাদার কুহকে।

বাঙ্গলার কুবেরের বরপুত্রগণ যে অকাতরে অর্থব্যয় না করেন এমন কথা আমরা বলি না। সেদিন দামোদরের প্রবল বন্যার সময়ে তাঁহাদের মুক্তহস্তে দানের কথা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যে মহাপুরুষ অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আজ পরলোকে—সেই স্বদেশহিতৈষী তারকনাথ পালিতের কথা স্বর্ণাক্ষরে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বুকে গাঁথা থাকিবে। সেদিনও কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবসম্মিলনীতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিলেন। এরূপ তিনি প্রতি বৎসরেই করেন।

বাঙ্গলার ধনীপুত্রগণ দানশীল একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু জানিনা এই দানের মধ্যে দাতার কি শুদ্ধতার অভাব রহিয়া গিয়াছে! বাঙ্গলার মেরুদণ্ড যে দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গলার প্রাণশক্তি কর্পূরের মত উপিয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার এই আসন্ন অবস্থার প্রতিকার থাকিতেও সেদিকে

কেহই লক্ষ্য করিতেছেন না।

আজ আমরা কমলার বরপুত্রগণকে একবার স্থির হইয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রসারণ করিতে অনুরোধ করি। আজ আমরা দেখাইতে চাই বাঙ্গলার ব্যাধি কোথায়? কোন্ রাক্ষসী তার বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে? তারপর যদি সামর্থ্য থাকে, ভগবদ্-কার্য্যে আস্থা থাকে, একযোগে প্রতীকারপরায়ণ হইয়া বাঙ্গলাদেশকে এই ব্যাধি হইতে মুক্ত করিতেই হইবে।

আমরা বলি, শুধু ধাত্রীবিদ্যায় অজস্র অর্থব্যয় করিলে বাঙ্গলার দুর্গতিদূর কোন কালেই হইবে না। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যই আমরা হাহাকার করি, বন্যাপীড়িতের জন্যই আমরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করি, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করি, আত্মসঙ্গতি অনুসারে দানও করি। কিন্তু হায়, ব্যাধি হয় কেন—দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী আসে কেন—তাহার চিন্তা আমরা একদিনও করিয়াছি কি?

অবশ্যই দেশ যখন অনাহারে মরিতেছে, মহামারীতে ছারখার হইতেছে, বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, তখন ইহার সাময়িক প্রতিবিধান কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিতে হইবে বলিয়া, সকলেই সকল সময়েই ক্ষণিক প্রতিবিধানে উন্মত্ত হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? যে কারণে দুর্ভিক্ষ আসে, যে কারণে ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিতে কটিবন্ধন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইব না—এমন বাতুলতা আমাদের দেশেই শোভা পায়।

গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরাজীশিক্ষার প্রচলন-মানসে কোটী কোটী

স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিলেও দেশের দুরবস্থা ঘুচিবে না; কেন ঘুচিবে না, এই প্রশ্নের আমরা একটা উত্তর দিতে চাই। এই যে বাঙ্গলাদেশে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া একটা নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহাতে যোগদান করিয়াছে কাহারা? কৃষ্ণনগর ডাকাইতির সংশ্রবে যাহারা অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইল, তাহারা যে সকলেই ইংরাজীশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী! আর কত দেখাইব—রাজনীতিক অপরাধীদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আজ যে শত শত বাঙ্গালীযুবক রাজসংশয়ে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়টা চাষাভূষা ব্যবসাদার আছে বল দেখি? তাই বলি ইংরাজী শিখাইয়া করিবে কি? তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের আয়োজন করিবার কিছু করিয়াছ কি? সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া দু'পাতা ইংরাজী পড়াইলে ফল যে বিষময় হইবে—একথা কি এখনও বলিয়া দিতে হয়?

তারপর ধর্ম্মান্দোলনে যে অজস্র অর্থব্যয় কর—তাহাতে দেশের কি? তথাকথিত ধার্ম্মিকের ভীষণ স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কি আছে? আপনার মুক্তি লইয়াই সে ব্যস্ত। তুমি যে ইহাদের লোটা কম্বলের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছ, তাহার ফল ঐ পরকালে, এই ইঙ্গিত করিয়া অন্নহীন অস্থিচর্ম্মসার বাঙ্গলাদেশে ইহারা যে নধর কান্তিমান্ শরীর ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে—কৈ দেশের তাহাতে কি উপকার হইতেছে?

এ ক্ষেত্রে অনেকেই বলিবেন, ধর্ম্মের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক কি?

আমরা তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলি, ধর্ম্মের সহিত তোমার যেমন দেহের সম্পর্ক, আমার ধর্ম্মের সহিত দেশের তেমন সম্পর্ক। 'কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া ত রবে না' বলিয়া ত মরণের দিকে পা বাড়াইয়া থাক না—প্রকৃতির আহ্বানে চর্ব্ব্য-চোষ্যরূপ আহারের আশায় ছুটাছুটি করিতে কি ভুলিয়া যাও?

ধর্ম্ম যেমন দেহ-ছাড়া নহে—তেমনই জগৎ ছাড়াও নহে। সেই পুরাতন ধর্ম্মভাব বিসর্জ্জন দিয়া আমরা দেশকে পূর্ণযোগ গ্রহণ করিতে বলি—চতুষ্পাদ ব্রহ্মের জাগ্রত অবস্থা এই দৃশ্যমান জগৎ—ইহার অনুশীলনে উপেক্ষা করিলে তুমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

বাঙ্গলার শোচনীয় দুরবস্থার মূল কারণ যে দরিদ্রতা, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—এই দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী ধীরে ধীরে বাঙ্গলাদেশে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। এক্ষণে অবস্থামত ব্যবস্থা না করিলে অচিরেই দেশ ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইবে—একথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। অতএব হে দেশের ধনিগণ! হে দেশের রাজন্যবৃন্দ! হে বঙ্গের ও সমগ্র ভারতের মাননীয় সদস্যগণ! সুরম্য হর্ম্ম্যে বসিয়া চাটুকারের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইও না; বিধাতা ধনে মানে যশে মর্য্যাদায় তোমাদের বিভূষিত করিয়াছেন, তোমাদের অহং-কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য নয়—পরন্তু যে দেশে জন্মিয়াছ সে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির জন্য। দেশবাসীর অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দাও—তাহা হইলেই দেশের জীবন ফিরিয়া আসিবে।

পূর্ব্বাভাস

সুফলা বঙ্গদেশ বিধাতার রোষনেত্রে ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে —ইহা আমাদের কর্ম্মফল। কোন্ কর্ম্মদোষে "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" সোণার বাংলার এ শোচনীয় অবস্থা—কোন্ মহাপাপে অন্নপূর্ণা বঙ্গজননী আজ ভিখারিণী নিরাভরণা—কোন্ অভিশাপে ভক্ত-কবি-বীর-প্রসবিনী দেশমাতৃকা আজ রুগ্ন সন্তানগণের দুর্ব্বলা জননী? যাহার জন্যই হউক আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

আজ বাংলা দেশের নরনারী—বন্যায়, ম্যালেরিয়ায়, দুর্ভিক্ষে, বিসূচিকায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বাংলার আশাভরসা নববলে বলীয়ান্ নিঃস্বার্থ যুবকবৃন্দ বিধির বিপাকে রাজরোষে দলে দলে কারাগারে অবরুদ্ধ হইতেছে—তস্কর, দস্যু, দুরাচারগণের উৎপীড়নে গ্রামবাসী সশঙ্ক—কপট, বাক্‌চাতুর্য্যে নেতার আসন অলঙ্কৃত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যোগী—সাধু অজ্ঞাতবাসে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছেন—কি উৎকট প্রায়শ্চিত্ত।

আজ এ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ভীষণানল নির্ব্বাপিত করিয়া, দেশের মধ্যে পুণ্যপ্রবাহ ছুটাইয়া দিতে হইবে—ফিরাইয়া আনিতে হইবে কবির ঋষির সেই আনন্দময় স্বর্ণযুগকে—যে যুগে মানুষ পূর্ণ হইয়া উঠিবে জ্ঞানে প্রেমে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে—দেশকে উন্নত করিয়া তুলিবে শিল্পে বাণিজ্যে ধনে ঐশ্বর্য্যে—যে যুগে সে আপনার উন্নত ললাটে গৌরব-টীকা ধারণ করিয়া মোহগ্রস্ত জগৎকে

হাঁকিয়া বলিবে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

হে বাঙ্গালী, এই সনাতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের উচ্চাসনে আরোহণ করিয়া সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিবার ভার তোমার উপরই বিধাতৃকর্ত্তৃক সংন্যস্ত হইয়াছে—এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা তারই পূর্ব্বাভাস।

দেব-লীলা

আজ বাংলার সর্ব্বত্রই শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রাণশক্তির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। নানা অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া এই প্রাণশক্তি শনৈঃ শনৈঃ বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। অবশ্যই অহঙ্কার বা অশুদ্ধ আধারভেদে কার্য্যের গতি নানা আকার ধারণ করিলেও সকলের ভিতর যে একটা তাজা প্রাণের সাড়া রহিয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে ?

স্বদেশী যুগের পর হইতে দেশের অনুষ্ঠানগুলি বিধাতার পরিমিতকারী বিধানে ক্রমশঃই নিয়মিত ও সুপরিচালিত হইয়া উঠিতেছে। কালে বাংলাদেশ যে জগতের চক্ষে মহামহিমান্বিত আদর্শ দেশ হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে আমাদের আর সন্দেহ নাই।

এই যে বাংলার ক্রমোন্নতি—ইহাতে মানুষের আদৌ হাত

নাই। যেখানে মানুষের অহঙ্কার, যেখানে মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানেই বিধাতার উদ্যতবজ্র ব্যর্থতার সম্মুখীন করিয়া, সেই অহং-বুদ্ধিকে ভগবদাশ্রিত, ভগবদ্‌পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, আজ স্বয়ং বিধাতাই বাঙ্গালীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সর্ব্বকর্ম্ম বিধাতার উদ্দেশ্যেই সংঘটিত, বাঙ্গালীর জীবন-তরণীর কর্ণধার—শ্রীভগবান্।

এই যে সেদিন মোহগ্রস্ত সুপ্ত বাঙ্গালীর কর্ণে স্বদেশীমন্ত্র প্রবেশ করিল, এই যে সে মহামন্ত্র হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া দেশ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, ইহার ভিতর মানুষের কর্ত্তৃত্ব ছিল কি? কোনও ব্যক্তিবিশেষের কল্পনায় ইহা সুসিদ্ধ হইয়াছিল কি? ইহা ভগবানের দান, তাঁহারই ইচ্ছাসম্ভূত।

এইরূপ বিচিত্র বিবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া ভগবান্ বাঙ্গালীর চরিত্রকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতেছেন। একটা অর্দ্ধোদয়যোগ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর কলুষিত জীবনে যে পুণ্যচিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা ভুলিতে পারিব কি? বাঙ্গালীযুবক সেদিন দেখিয়াছে, যে তাহার একটী মা নয়, একটী ভগ্নী নয়—সাত কোটী নরনারী তার পরমাত্মীয়। দেশ সেদিন মূর্ত্তিমতী হইয়া বাঙ্গালীর জীবন ধন্য করিয়া দিয়াছে। তারপর বর্দ্ধমানের প্রবল বন্যা। সেদিনও ভগবান্ আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে দেশ আমাদের কত প্রিয়। বস্তুতঃ, আমরা দেশকে যে কত ভালবাসি সে দিন তাহার পরিচয় পাইয়াছি। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, আপামর-

সাধারণ বর্দ্ধমানের রক্ষাকল্পে যে উন্মাদনা দেখাইয়াছে, তাহা দেশ-ভক্তির যথার্থ অভিব্যক্তি। এ ঘটনা কি মানুষের সৃষ্টি? এ যে দুঃখের মধ্যে সুখের সৃষ্টি, এ যে "করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে, সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারই দুয়ারে!" আবার সেদিন এক নূতন ঘটনা, নূতন সৃষ্টি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বাংলাদেশ যখন খাঁটী সোণা হইবার জন্য জলন্ত অঙ্গারের মধ্যে দগ্ধ হইতেছিল, কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনার পুণ্যচরিত্র বিকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছিল, দেবচরিত্র লাভের ঘনঘটা অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্য-পথে ক্ষণেকের তরে পথ হারাইয়া, হতাশ নয়নে ভগবানের প্রেরণার প্রতীক্ষা করিতেছিল, দারুণ অস্পষ্টতার মধ্যে পড়িয়া পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে অসমর্থ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ক্ষুদ্র চন্দন-নগরকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্ যে লীলা প্রকট করিলেন, তাহা আশাতীত, কল্পনাতীত, ধারণাতীত।

বাংলার ইতিহাসে এ এক নূতন ঘটনা, নূতন আলো, নূতন যুগ। বাঙ্গালী, বীরের মত মরিবার অধিকার পাইয়া, ২০ জন যুবক যখন ইউরোপের মহাযুদ্ধে যোগ দিবার জন্য বীরদর্পে চন্দন-নগর পরিত্যাগ করিল, তখন বাংলার যে উৎসাহ, যে উত্তেজনা, যে অভাবনীয় ভাবের দ্যোতনা দেখিয়াছি তাহা জীবনে ভুলিব না। রঙ্গমঞ্চেই জননী সন্তানকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করে দেখিয়াছি, আর আজ প্রত্যক্ষ জীবনে সে দৃশ্য দেখিলাম— এই জড়চক্ষে এই বাঙ্গালীর অর্দ্ধমৃত সংসারে দেখিলাম—জনকজননী

পুত্রের গলায় বিজয়মাল্য পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল—পত্নী যুদ্ধ-গমনোন্মুখ পতিকে শেষ প্রণাম করিল—সহোদরা স্বহস্তে ফুলের মালা গাঁথিয়া সহোদরের কণ্ঠে পরাইয়া দিল—আর আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী হুলুধ্বনি করিল—জষ্টিস্ চন্দ্রাভর্‌কর, জষ্টিস্ চৌধুরী, এস্ পি সিংহ, মতিলাল ঘোষ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার মনীষীগণ এ নূতন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন।

এঁকি ভগবানের লীলা নয়—একি তাঁর আলো নয়—যে আলোকে আজ বাংলা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল? তাই বলি, হে বাঙ্গালী, আজ এই আশার দিনে, অহমিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া প্রতীক্ষা কর—যিনি বলিয়া গিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আত্মকথা

এই সংখ্যায় প্রবর্ত্তকের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হ'ল—আজ তার হিসাব নিকাশের দিন।

পৃথিবীর মধ্যে থেকে পৃথিবীর সাহায্যেই আমরা মুক্ত হ'ব, পৃথিবীকে জয় করব, জরামরণশীল মরজগতেই অমরলোকের প্রতিষ্ঠা করব। এমন যাদের উদ্দেশ্য তাদের সবটাই যে পাগলামী একথা আমরা বুঝতে পারি—আবার এও বুঝতে পারি, যে সত্যের ইষণায় আজ আমরা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছি—যে অন্তঃপ্রকৃতির গুপ্ত প্রেরণায় আমরা পৃথিবীর সমস্ত বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, যে শক্তির পুণ্যপুলকে নির্য্যাতন দারিদ্র্য এমন কি মরণকে পর্য্যন্ত পায়ের তলায় ফেলতে সাহসী হয়েছি—সে ইষণা সে প্রেরণা সে শক্তির প্রভাব বড় অল্প নয়, তুচ্ছ নয়, সঙ্কীর্ণ নয়—সে উদার, মুক্ত, অনন্ত—তার মহান্ বিরাট ছায়ায় দাঁড়িয়ে এ গর্ব্ব সার্থক হবে, সফল হবে, পূর্ণ হবে।

আমরা এক সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে গিয়ে অন্য সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চাই না, আমরা এক দেশের সার্থকতা আনতে গিয়ে অন্য দেশের হৃদয়-রক্ত শোষণ করতে চাই না, আমরা পৃথিবীর কোনও জাতির সহায়তায় আমাদের দেবকার্য্য সংসাধন করতে চাই না—আমরা নিজেরা স্বর্গ হ'তে সুরধুনীকে মাথায় করে' ধরাধামে প্রতিষ্ঠা করব, তার কুলুকুলু পুণ্য কল্লোলে

ভারতের আকাশ প্রান্তর মুখরিত হবে, তার পবিত্র বারিবিন্দু-স্পর্শে ভারতের মাটী অমৃতময় হবে, তাতে সোণা ফল্‌বে—ভারতবাসী মায়ের স্তন্যপীযূষপানে জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে জগতে অপরাজেয় হ'য়ে উঠ্‌বে।

নবযুগে ভারতবর্ষ যে বাণী শ্রবণ করেছে, সে মানুষের নয়, কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নয়, সে মরজগতেরও নয়—সে অপার্থিব, সে বিধাতার, সে শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্যশঙ্খের গভীর নিনাদ, সে মরজগতে স্বর্গরাজ্যসংস্থাপনের নিগূঢ় সঙ্কেত; তাই আমাদের গতি অপ্রতিহত—পাহাড় ভেদিয়া সাগর ছেঁচিয়া আমাদের পথ প্রস্তুত কর্‌তে হবে—এ যে ভগবানের আহ্বান।

মানুষের কার্য্য প্রথম বাধায় ভেঙে পড়ে, দেবকার্য্য বাধায় বাধায় শক্তিশালী হ'য়ে উঠে। আমরা আরো বাধা পেতে চাই—ভারতবর্ষ যে দেবতার আহ্বানে জেগে উঠেছে, তাহাই প্রমাণ কর্‌তে চাই—ভেঙেচুরে ধুলায় মিশে যাক না আমাদের সমস্ত অস্তিত্বটা—যদি আমাদের মধ্যে ভাগবত উদ্দেশ্য থাকে, সে গজিয়ে উঠ্‌বে সহস্রমুখী হ'য়ে, ছেয়ে ফেল্‌বে তার শাখাপল্লবে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীটাকে; আর আমাদের অহং দিয়ে যদি কিছু গড়ে' তোল্‌বার কামনা করে' থাকি, তবে সেটা এই মুহূর্ত্তেই মিশে যাক, ধ্বংস হ'য়ে যাক, নিষ্পেষিত হ'য়ে যাক কালের কুলালচক্রে; এ অহঙ্কারের আবর্জ্জনাস্তূপ প্রকৃতির সমার্জ্জনীর আঘাতে যত শীঘ্র দূর হ'য়ে যায় ততই মঙ্গল, ততই শ্রেয়ঃ।

আমরা আজ এই এক বৎসর ধরে' অতি ক্ষীণ স্বরে গেয়ে

গেছি বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে আমাদের হৃদয়-সঙ্গীত—আমরা জানাতে চেষ্টা করেছি—আমাদের লক্ষ্য কি, আমাদের কিসের আকাঙ্খা। আমরা ইঙ্গিতে বলেছি—আমাদের পথে কত বাধা, কত বিভীষিকা, কত বিপদ্। জানিনা আজ একজনও আমাদের অস্ফুট বাণী বুঝেছেন কি না, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন কি না, আমাদের মর্ম্মবেদনার অংশভাগী হয়েছেন কি না।

আমরা পরের কথা বলি না—পরের আচরণ অতি কঠোর হ'লেও সে যে আমাদের সাধনারই অনুকূল, সে যে কালীশক্তিরই বাহ্যাড়ম্বর—বাহিরের এই ঘনঘটা বজ্র উল্কাপাতের নিম্নে থেকে আমাদের অমৃতের সন্ধান করতে হবে।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেশের হৃদয় জয় করতে চাই, আমাদের আদর্শের পথে দেশই যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। পুরাতনের পতিবেগকে বিলুপ্ত করে' দেশকে নূতনের অধিকারে আন্তে চাই। ভগবানের খণ্ড আদর্শ ভেঙে তাঁর পূর্ণস্বরূপের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। অসংখ্য আত্মবিলয়ের মধ্যে যে কপট আত্মপ্রতিষ্ঠার লোলুপ রসনা বিস্তার করছে, তার ভুল ভেঙে দিতে চাই—ব্যক্তিগত জীবনের প্রাধান্যের তলে দাঁড়িয়ে যারা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়-বিশেষের সৃষ্টি করতে উদ্যোগী, তাদের সে পুরাতন প্রথা অপসারিত করে' দিতে চাই। চাই ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড সত্যের উপাসক করে' তুলতে—চাই ভোগের ও যোগের সমন্বয় সাধন করে' এই জগতেই স্বপ্নলব্ধ সে স্বর্গরাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করতে।

মোহনিদ্রারত ভারতবাসীর কাণে সহসা শ্যামরায়ের মধুর মুরলীধ্বনি বেজে উঠে তাদের একটু বিভ্রান্ত করে' তুলেছিল, কাজেই অনেক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়ে' দেশটা ব্যতিবস্ত হ'য়ে উঠেছে—অচিরেই এ'র সমতা আস্‌বে, সমগ্র দেশ সমগ্র আর্য্যসন্তান বিধাতার আহ্বানে শুদ্ধ হ'য়ে ভাগবত নির্দ্দেশেই চল্‌বে —আত্মশক্তির উদ্বোধন করে', ঋতময় জীবনলাভপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষকেই দেবলীলার ক্ষেত্র করে' তুল্‌বে।

আমরা সারা-বর্ষ ধরে' এই সঙ্গীতই গেয়ে এসেছি। আমরা এই মহান্ আদর্শেরই উপাসক—আমরা আত্মশক্তির দ্বারাই আমাদের অতীত এক শক্তির উপলব্ধি কর্‌বো—আর সেই মহীয়সী প্রকৃতির পশ্চাতেও যে পরাৎপর পুরুষ অবস্থান কর্‌ছেন, তাঁরই যন্ত্রস্বরূপ চালিত হ'ব। আমাদের ভোগও তাঁর, আবার ত্যাগও তাঁর—আমাদের আশা আকাঙ্খা উদ্দেশ্য সব তাঁরই নির্দ্দেশে। যখন মানুষের স্বভাব-সুলভ দুর্ব্বলতা এসে আমাদের এই যোগ ভঙ্গ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌বে, তখন তাঁরই কথা গেয়ে আত্মজয় কর্‌বো—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।

সমাপ্ত